বঙ্গবন্ধুর
স্বদেশ প্রত্যাবর্তন
ও
শাসনকাল ১৯৭২-১৯৭৫
প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আখতার হোসেন

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে দীর্ঘ ৯ মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ১০ জানুয়ারি বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা, স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন। জীবন-মৃত্যুর ভয়ঙ্কর অধ্যায় পার হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে মহান এ নেতার প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে পূর্ণতা পায় মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের বিজয়।

অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন ঢাকায় আসেন তখন আনন্দে আত্মহারা লাখ লাখ বাঙালি তাকে স্বতঃস্ফূর্ত সংবর্ধনা জানায়। সেইদিন বিকাল ৫ টায় রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) প্রায় ১০ লক্ষ মানুষের উপস্থিতিতে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম ভাষণ দেন। এই ভাষণে বঙ্গবন্ধু সশ্রদ্ধচিত্তে সবার ত্যাগের কথা স্মরণ করে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত সময়কালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গন ছিল সীমাহীন দুর্নীতি ও অস্থিরতায় পরিপূর্ণ। অর্থনৈতিক স্বল্পতার কারণে সরকার সাধ্যমতো কাজ করেও সুফল পায়নি। অপরদিকে স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মত্যাগকারী জনগণের সরকারের প্রতি প্রত্যাশা ছিল অনেক বেশি। চাওয়া পাওয়ার মধ্যকার এ ব্যবধান রাষ্ট্রীয় সংহতি ক্ষতিগ্রস্থ করে। তাছাড়া স্বাধীনতা বিরোধী চক্র এ সময় মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। বাংলাদেশকে একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্যে ১ম ষড়যন্ত্র করা হয়।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট বাঙালি জাতির পিতা, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি ও স্বাধীন বাংলাদেশের রূপকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সাল একটি শোকাবহ ও দুঃখময় দিন। কেননা জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে দেশের রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতিসহ নানা ক্ষেত্রে এক আমূল আদর্শিক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যা ও তাঁর সরকারকে উৎখাতের পর তাঁরই মন্ত্রিসভার বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমেদ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা দখল করেন। তিনি জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করেন। তার ভাষণে তিনি মুসলিমবিশ্বসহ সকল দেশের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করেন। ক্ষমতায় আরোহণের পর তিনি যে মন্ত্রিসভা ঘোষণা করেন, এর অধিকাংশ সদস্যই বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রীসভার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও শাসনকাল ১৯৭২-১৯৭৫

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও শাসনকাল ১৯৭২-১৯৭৫

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আখতার হোসেন

বিএ (সম্মান) বাংলা; এমএ (বাংলা); পিএইচডি (বাংলা)

চেয়ারম্যান, ফোকলোর বিভাগ,

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও
শাসনকাল ১৯৭২-১৯৭৫
প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আখতার হোসেন
প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১৮
প্রকাশক : মুহাম্মদ জহিরুল হাসান
প্রত্যাশা প্রকাশনী
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০১৭০১৮৮১২৯০
E-mail : protyashaprokashani@gmail.com

প্রচ্ছদ : মুহাম্মদ জহিরুল হাসান
বর্ণবিন্যাস : নিপুণ গ্রাফিক্স
পরিবেশক : অবধূত বইঘর
মুদ্রণ : এম আর প্রিন্টার্স
ISBN : 978-984-93031-7-6
মূল্য : ১৭৫.০০ টাকা মাত্র

Bangobandhur Swadesh Protyabartan
O
Shasankal 1972-1975
Written by Profesor Dr. Mohammad Akhter Hossain
Published by Muhammad Johirul Hasan, Protyasha Prokashani
34 North Brook Hall Road, Banglabazar, Dhaka-1100
Price : Tk. 175.00 US$ 6.

উৎসর্গ

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের জন্য
যাঁরা জীবন বাজি রেখেছিলেন
সেইসব মহান নেতাদের
উদ্দেশ্যে—

ভূ মি কা

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও শাসনকাল ১৯৭২-১৯৭৫

এক.

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পরিধি বাঙালির জাতীয় জীবনে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যূদয় যেমন একদিনে আসেনি, তেমনি সহজলভ্য ছিলনা। দীর্ঘ দিনের ত্যাগের ফসল হলো এই স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়। নয় মাসের সশস্ত্র রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে জন্ম নেয় বাংলাদেশ। অর্জিত হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

১৯৪৭ সালের ভারত বিভক্তি ছিল উপমহাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে বাংলাদেশের পর্যন্ত হলো বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসের পরিধি। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ পরিধি নিম্নরূপ:

১. সাংস্কৃতিক ঐক্য : স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে সাংস্কৃতিক ঐক্য ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বাঙালি জাতির ছিল অভিন্ন সংস্কৃতি। বাঙালির ভাষা, আচার-আচরণ ও মূল্যবোধ ছিল অভিন্ন। ফলে জাতীয়তাবোধ ছিল সুদৃঢ়। এ জাতীয়তাবোধ দূর্বল করতে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালি সংস্কৃতির উপর আগ্রাসন শুরু করে। এ আগ্রাসনের অংশ হিসেবে তারা প্রথমে বাঙালির ভাষার উপর আঘাত হানে। সমগ্র পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬% এর মাতৃভাষা বাংলা হলেও তারা উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার চেষ্টা করে। ফলে বাঙালি পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর এ প্রস্তাব মেনে নিতে পারেনি। ১৯৫২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে বাংলার জনগণ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে রাস্তায় নেমে পড়ে। এসময় পুলিশ মিছিলে গুলি বর্ষণ করলে

রফিক, জব্বার, সালাম, বরকতসহ আরো অনেকে নিহত হন। কিন্তু আন্দোলন অব্যাহত থাকে। এক পর্যায়ে পাকিস্তান সরকার বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। বাঙালির এ জয় এক পর্যায়ে বাঙালি জাতিকে পুরোপুরি স্বাধীন হতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

২. পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক আচরণ : পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে বৈষম্যের বীজ নিহিত ছিল। শাসকরা ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানি এবং তারা পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের উপর প্রতিক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নের পরিবর্তে তারা সবসময় দমন পীড়ন চালাতো। অর্থনৈতিক, সামাজিক, সামরিক প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তারা বাঙালির উপর বৈষম্যমূলক আচরণ করতো। এর মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পূর্ব পাকিস্তানে ৬০% রাজস্ব আদায় হতো অথচ এর প্রায় তিন-চতুর্থাংশ ব্যয় হতো পশ্চিম পাকিস্তানে। কেন্দ্রীয় সরকারের উন্নয়ন ব্যয়ের ২৫%-৩০% ব্যয় হতো পূর্ব পাকিস্তানে যা পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাঙনের অন্যতম কারণ।

৩. একুশ দফা ছয় দফা : ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট যে ২১ দফা কর্মসূচি প্রণয়ন করে তার প্রতি বাংলার জনগণ সমর্থন দিলে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকরা সে জনমতের গুরুত্ব দেয়নি। ছয় দফা ছিল বাঙালির প্রাণের দাবি। অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এ দফাগুলো দেশ রক্ষার অধিকারে রূপ নেয়।

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যূদয়ের ইতিহাসের পরিধি ছিল এক সংগ্রামী ইতিহাস। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে অর্জন করে স্বাধীনতা। জন্ম নেয় একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

বাংলার ভৌগোলিক অবস্থান এ ভূখণ্ডের গঠনগত ইতিহাস দ্বারা নির্ধারিত। অবস্থানগত দিক থেকে বাংলা ভারতীয় উপমহাদেশের সবপূর্ব প্রান্তে অবস্থিত। পূর্ব-পশ্চিম উত্তরে পাহাড় ও জঙ্গলাকীর্ণ উচ্চ ভূমি এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর দ্বারা নির্ধারিত এমন বেষ্টনীর মধ্যেই বাংলার অবস্থান। বাংলার অবস্থান সম্পর্কে নীহার রঞ্জন রায় বলেন, একদিকে সুউচ্চ পর্বত, দুই দিকে কঠিন শৈল ভূমি আর একদিকে বিস্তীর্ণ সমুদ্র, মাঝখানে সমভূমির সাম্য এটিই বাঙালির ভৌগোলিক ভাগ্য।

বাংলা ভূখণ্ডের উত্তর দিকের সীমা নির্ধারণ করেছে হিমালয় পর্বতমালা। হিমালয় সৃষ্টি করেছে গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক বিভাজন। হিমালয়ের নিম্ন উপত্যকায় দার্জিলিং ও জলপাইগুরি জেলা। এ দুই জেলার পশ্চিমে নেপাল, পূর্বে ভুটান রাজ্য সীমা। এছাড়া বাংলার উত্তর পূর্ব দিকের সীমা ব্রহ্মপুত্র নদী দ্বারা নির্ধারিত।

বাংলার পূর্ব দিকের সীমা নির্ধারণে পর্বত ও নদীর ভূমিকা অন্যতম। বাংলা পূর্বসীমার উত্তরে ব্রহ্মপুত্র নদ, মধ্যে গারো, খাসিয়া ও জৈন্তিয়া পাহাড়, দক্ষিণে লুসাই, চট্টগ্রাম ও আরাকান শৈলমালা ত্রিপুরা এবং চট্টগ্রাম শৈলশ্রেণী লুসাই জেলা এবং ব্রহ্মদেশ তথা মায়ানমার থেকে বাংলাকে পৃথক করেছে। একই সাথে এ দুটি শ্রীহট্ট তথা সিলেটকেও ত্রিপুরা ও চট্টগ্রাম থেকে পৃথক করেছে। পূর্ব-দক্ষিণে পার্বতাঞ্চল হলেও মায়ানমারের সাথে প্রাচীন কাল থেকে বাংলার যোগাযোগের পথ ছিল।

বাংলার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অপর একটি প্রাকৃতিক গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতার প্রকাশ। বঙ্গোপসাগরের তট ঘিরে রয়েছে খুলনা, বরিশাল, ফরিদপুর, নোয়াখালি, চট্টগ্রামের সমতট ভূমির সবুজ আস্তরণ। নদী বিধৌত পলি দ্বারা গঠিত বাংলা এক বিশাল সমভূমি। বাংলা অঞ্চল অবস্থানগত দিক থেকে প্রাকৃতিক বেষ্টনী দ্বারা আবদ্ধ।

অবস্থানগত কারণে বাংলার জলবায়ু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ। প্রাচীন বাংলার জনমানসে এর বহুমুখী প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীন বিভিন্ন উৎসে বাংলার জলবায়ুর তথ্য পাওয়া যায়। বাংলা অবস্থানগত কারণে মৌসুমি জলবায়ুর অন্তর্গত একটি অঞ্চল। বাংলার জলবায়ু নিম্নরূপ :

বাংলার জলবায়ুর অবস্থা : বাংলা অঞ্চলের উপর দিকে কর্কট ক্রান্তি রেখা গিয়েছে বলে এ অঞ্চলের আবহাওয়া মৃদু ও নাতিশীতোষ্ণ। এখানে মৌসুমি বায়ুর কারণে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। বাংলার বায়ুমণ্ডল এ কারণে আর্দ্র এবং জলীয় বাষ্পপূর্ণ থাকে। কালবৈশাখী, ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাস প্রায়ই এখানে প্রলয় ডেকে নিয়ে আসে। বাংলার বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ পশ্চিমাংশে ৬০ ইঞ্চি এবং উত্তরাঞ্চলে বিশেষ করে সিলেটে ২০০ ইঞ্চি। সাধারণ ভাবে জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত এখানে বর্ষাকাল থাকে। শুকনো মৌসুমে তাপমাত্রা উঠা-নামা করে। শীতকালে ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে তাপমাত্রা নেমে আসে এবং গ্রীষ্মকালে কখনো কখনো ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস

ছেড়ে যায়। মৌসুমি বায়ু বাংলায় অবস্থানের কারণেই এ অঞ্চলকে খুব বেশি পরিমাণে প্রভাবিত করে। জুন মাসের শুরুতে বঙ্গোপসাগর হতে আগত উষ্ণ ও আর্দ্র দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের পূর্ব ও উত্তরাঞ্চলের পাহাড়িয়া এলাকা তথা হিমালয়ে বাধাগ্রস্ত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায়।

বৃষ্টিপাতের সময় প্রায়ই নিম্নচাপ বা ঘূর্ণবাতের বা সাইক্লোনের সংযোগ থাকে। এছাড়া প্রতি বছর বাংলার উপর দিয়ে কালবৈশাখী ঝড় বয়ে যায়। বাংলার প্রাচীন এ জলবায়ুর পরিচিত পাওয়া যায় হিউয়েন সাঙয়ের বিবরণে। বাংলা অঞ্চল মৌসুমি জলবায়ুর অন্তর্গত হওয়ায় এখানে নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া থাকে এবং অবস্থানগত কারণে বাংলায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।

ভূগোল ও ইতিহাসের সাথে গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। ভূগোলভিত্তিক ইতিহাস অনেকদিন ধরেই ইতিহাস পাঠের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসেবে স্বীকৃত। তাই বাংলার স্বাধীনতার ইতিহাসের সংঙ্গে ভৌগোলিক প্রভাবসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচীনকালে বাংলা বলতে সমগ্র বাংলাদেশ এবং পশ্চিম বঙ্গকে বুঝাত না। এর বিভিন্ন অঞ্চল বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। একক বাংলা কখন থেকে শাসন হতে থাকে তা বলা কঠিন। তবে বর্তমান পশ্চিম বাংলা এবং বাংলাদেশ নিয়ে একটা ভৌগোলিক ইউনিটে বাংলা গঠিত ছিল।

মোটামুটিভাবে ১৯৪৭ এর পূর্বে ব্রিটিশ ভারতের 'বেঙ্গল' প্রদেশের ভূখণ্ডই বাংলা নামে পরিচিত ছিল। এটা পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিম বঙ্গ নিয়ে গঠিত ছিল। ইতিহাসের দৃষ্টিতে এ ভূখণ্ডের একটি আঞ্চলিক সত্তা ছিল এবং ভৌগোলিকগণও বাংলাকে একটি ভৌগোলিক অঞ্চল বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। প্রায় ৮০,০০০ বর্গ মাইল বিস্তৃত নদী বিধৌত পলি দ্বারা গঠিত এক বিশাল সমভূমি এ বাংলা। বাংলার পূর্বে ত্রিপুরা, উত্তরে নেপালের তরাই অঞ্চল। বাংলার পশ্চিমের সীমায় রাজমহল ও ছোট নাগপুর পর্বতরাজির উচ্চভূমি এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।

ভৌগোলিকভাবে বাংলা ভারতীয় উপমহাদেশের দক্ষিণ পূর্ব কোণে অবস্থিত। এ ভূখণ্ড ভারতের সাথে পূর্ব এশিয়ার যোগাযোগের ক্ষেত্রে Land bridge হিসেবে কাজ করছে। পুরা বাংলা ভৌগোলিকভাবে একটি অঞ্চল। কেননা এর চারদিকেই প্রকৃতি বা সীমা রয়েছে। ইংরেজরা এ অঞ্চলকে 'বেঙ্গল' নামে অভিহিত করতো। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে ইউরোপীয়দের

লেখনীতে 'বঙ্গেলা' নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। মুঘল আমলে এ অঞ্চল 'সুবা বাঙালি' নামে পরিচিত ছিল। আবুল ফজল বাঙালা নামের ব্যাখ্যায় বলেন, বাঙালা পূর্বে 'বঙ্গ' ছিল। এখানকার রাজারা প্রাচীনকাল থেকে ১০ গজ উঁচু এবং ২০ গজ বিস্তৃত আল নির্মাণ করতেন। এ থেকেই বাংলা নামের উৎপত্তি। সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ সর্ব প্রথম শাহ-ই-বাংলা উপাধি ধারণ করেন। সমগ্র বাংলায় তিনি আধিপত্য বিস্তার করেন। তিনি বাংলায় তিনটি প্রশাসনিক এলাকা গঠন করেন। এগুলো হচ্ছে লখনৌতি, সাতগাঁও এবং সোনারগাঁও। এতে বলা যায়, আবুল ফজলের বাঙালা বা ইউরোপীয়দের 'বাঙাল' বা বেঙ্গল বলতে সারা বাংলাকে বুঝান হতো। যদিও এ অঞ্চল প্রাচীনকাল থেকে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। তথাপি মুঘল শাসনের সময় থেকে বাংলা নামের পূর্ণতা আসে।

বাংলাদেশের অবস্থান ও ভূপ্রকৃতি এদেশকে এক নতুন রূপ দান করেছে। সমাজনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতিতে ভূপ্রকৃতির প্রভাব অপরিসীম। এদেশের ভূপ্রকৃতির উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে এদেশের মানুষের জীবনধারা। তাই দ্বিজাতি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটির উদ্ভব হলেও বাঙালি জাতি তা মনে প্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি। অপরদিকে ভৌগোলিক ঐক্য না থাকায় পশ্চিম পাকিস্তানিরাও বাঙালিদের আপন করে ভাবতে পারেনি। তাই নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ব বাংলার উপর শুরু করে ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ। ভিন্ন মন মানসিকতার কারণে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালি জাতিকে দমন করতে শুরু করে। তারা সামাজিক, রাজনৈতিক, সামরিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আগ্রাসন শুরু করে। কিন্তু বাঙালি জাতি এসব বৈষম্যমূলক নীতির বিরুদ্ধে একসময় গণআন্দোলন গড়ে তোলে এবং স্বাধীনতা অর্জন করে। অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের।

বাঙালি জাতির অতীত ঐতিহ্যময় ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এ জাতি অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে সর্বদা প্রতিবাদ করে এসেছে। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের মূল কেন্দ্র ছিল বঙ্গ প্রদেশ। বাঙালিরা সর্বদা স্বাধীনচেতা। তাই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সকল বৈষম্য ও অবিচারের প্রতিবাদ করেছে দৃঢ়ভাবে। ঐতিহাসিক দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগষ্ট যে পাকিস্তানের জন্ম হয় তার মূল

উৎস ছিল দ্বিজাতি তত্ত্ব। কিন্তু বাঙালি জাতি মুসলিম হবার চেয়ে বাঙালি হওয়ার দিকে বেশি মনোযোগী হয়। দ্বিজাতি তত্ত্ব বাঙালিরা মেনে নেয়নি। ফলে ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র লাভ করে। পাকিস্তান সৃষ্টির শুরু থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী বুর্জোয়া শ্রেণিতে পরিণত হয়। বুর্জোয়া শ্রেণি পূর্ব বাংলাকে অর্থনৈতিকভাবে চরমভাবে শোষণ করে। যার বিরুদ্ধে বাঙালি জাতি ন্যায় অধিকার ও দাবি আদায়ের সংগ্রামে লিপ্ত হয়। অবশেষে বাঙালি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র লাভ করে।

দুই.

যে কোনো সমাজ ব্যবস্থায় নৃ-তাত্ত্বিক ধারণা একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা। বাঙালি জাতির নৃ-তাত্ত্বিক ধারা জটিল প্রকৃতির। একটিমাত্র নরগোষ্ঠী থেকে উৎপত্তি হয়নি বাঙালি জাতি, কয়েকটি নরগোষ্ঠীর মিলিত ফল বাঙালি। বাঙালি নৃগোষ্ঠীর ভিন্ন ভিন্ন চেহারা পরিলক্ষিত হয়। বাঙালির আকার মাঝারি তবে ঝোঁক খাটোর দিকে, চুল কালো, চোখের মনি হালকা থেকে ঘন বাদামি। বাংলাভাষী মানুষকে তাই নৃতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা যায় বাঙালি জাতি।

বাংলাদেশের মানুষের বসবাস কখন থেকে শুরু তা জানার কোনো সুস্পষ্ট ইতিহাস নেই। বাঙালি জাতি সম্পর্কে নৃ-তাত্ত্বিকদের ধারণা এটি একটি মিশ্রিত জাতি এবং এ অঞ্চলে বসবাসকারী আদিমতম মানব গোষ্ঠীর অন্যতম। পৃথিবীর বহুজাতি বাংলায় প্রবেশ করেছে এবং বসতি গড়ে তুলেছে। আবার এখান থেকে চলেও গেছে। ফলে বাঙালির রক্তে মিশেছে বহু এবং বিচিত্র নরগোষ্ঠীর অস্তিত্ব।

সুনির্দিষ্ট মানবজীবনের অস্তিত্বহীনতা, বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর বসবাস ও সংমিশ্রণে এবং বহিরাগতদের আগমন ও প্রভাবের কারণে অতীতে এদেশের জনগোষ্ঠীর একটি কাঠামোগত নৃ-তাত্ত্বিক উপাদান চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। তাহলো দীর্ঘ শিরস্ক উপাদান যা ঐ বৈশিষ্ট মণ্ডিত জনগণের রয়েছে।

বঙ্গদেশে আদি অস্ট্রেলয়েড এর নিকটতম প্রতিনিধি হিসেবে মুণ্ডা, মালে, খাসিয়া, ওরাঁও, সাঁওতাল ও মাল পাহাড়িয়াদের চিহ্নিত করা যেতে পারে। বাঙালি জাতির মধ্যে প্রতিনিধিত্বমূলক দ্রাবিড় জাতির বিশুদ্ধ কোনো জনগোষ্ঠী পাওয়া না গেলেও মধ্যম নাসাকৃতি, দীর্ঘ, শিরস্কতা ও মোটামোটি

সুন্দর অবয়বের বৈশিষ্ট্যকে দ্রাবিড় হিসেবে গণ্য করা হত। রিজলি ও অন্যান্যদের সংগৃহীত উপাত্ত থেকে দেখা যায় যে, হিন্দু জাতির মধ্যে মহিষ্য, মুচি, বাগদি, রাজবংশী, ক্ষত্রিয় এবং মুসলমানদের মধ্যে এ বৈশিষ্ট্যের আধিক্য দৃষ্ট হয়। ইন্দো ভূমধ্য দীর্ঘ শিরস্ক উপাদানগুলো আমাদের মধ্যে দেখা যায়। বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে এ উপাদানগুলো গোয়ালা, মুচি, রাজবংশী, ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণদের মধ্যে দেখা যায়। বাঙালিদের মধ্যে দীর্ঘ শিরাকৃতির মোঙ্গলীয় জন থেকে এসেছে। এ উপাদানগুলো ময়মনসিংহবাসী, গারো জন, বগুড়া, ময়মনসিংহের কোচ ও হাজংদের মধ্যে এ ধরনের বৈশিষ্ট্যর কিছুটা ঝোঁক পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর সাথে মিশে বাঙালি একটি সংকর জাতিতে পরিণত হয়েছে। আর্যদের সাথে সাঁওতাল, গারো, মুণ্ডা ইত্যাদির সংমিশ্রণ ঘটেছে। পার্থীক, অক, তুর্কি পাঠান, ইরানি আরবসহ বিভিন্ন গোষ্ঠীর প্রভাব বাঙালিদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। বহিরাগত জনগোষ্ঠী ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং জন তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে নতুন নতুন সংমিশ্রণ ও সংযোজন হয়।

বাঙালি নৃ-গোষ্ঠীর গঠন প্রকৃতি সম্পর্কে হার্বাট রিজলে তার "Tribes and Caste of Bengal" গ্রন্থে ভারতীয় উপমহাদেশের মানুষের নৃ-তাত্ত্বিক গোষ্ঠীর পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন, এদের অধিকাংশের মাথা গোল, নাক মধ্য আকৃতি থেকে চওড়া এবং উচ্চতা মাঝারি বাঙালিদের গায়ের রং শ্যামলা, কালো ও কিছুটা পীত বর্ণ। তাই তিনি বলেছেন "Bengal itself was mustly Mesatic ephalice and dolicho Cephalism only appeus in some of dravian tribes."

নীহার রঞ্জন রায় বাঙালির ইতিহাস গ্রন্থে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির উৎপত্তি সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য প্রদান করেছেন। তিনি বলেন, অনেক রূপান্তর ও পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে অস্ট্রেলীয় ও দ্রাবিড় নৃ-গোষ্ঠীর ধর্মীয় আচার বিশ্বাস হিন্দু সমাজে অনুপ্রবেশ করে। এতে বাঙালি হিন্দুদের নৃ-গোষ্ঠীগত পরিচয় ফুটে ওঠে। তিনি বলেন, অস্ট্রেলীয় ও দ্রাবিড় জাতির সাথে আর্যরা মিলিত হয়ে বাঙালি জাতির সংমিশ্রণ হয়।

হান্টার তার "Annals of Rural Bangal." এবং The Indian muslman." গ্রন্থে বলেছেন যে, এদেশের মুসলমানরা উচ্চবর্ণের হিন্দু এবং বাকি সব বৌদ্ধ ধর্ম থেকে রূপান্তরিত হয়ে মুসলমান হয়েছে। বিরাজ শঙ্কর

বাঙালি নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীকে দ্রাবিড়ীয় আদি অষ্ট্রেলীয়, মঙ্গেলীয় ও ককেশীয় এ চারভাগে ভাগ করেছেন। দ্রাবিড় গোষ্ঠী সিলেট অঞ্চলে, আদি অস্ট্রেলীয়রা সাঁওতাল ও খাসিয়ারা যারা বর্তমানে বাংলাদেশের নাচোল, পোরশা, হরিপুর ও বাণিসানকাইল এ দেখতে পাওয়া যায়। সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রামে খাসিয়াদের বসতি রয়েছে যারা অধিকাংশ চা শ্রমিক।

বাঙালি ও আলপাইন মানব গোষ্ঠীর মধ্যে শারীরিক বৈশিষ্ট্য যথেষ্ট মিল রয়েছে। ফজলে রাব্বী বলেন তার 'হকিকাতে মুসলমানে বাঙালি' গ্রন্থে বাংলাদেশের মুসলিম জনগোষ্ঠীতে তুর্কি, আফগান, আরবি, আবিসিনীয়া ও ইরানিদের প্রভাব রয়েছে। বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণের ফলে বাঙালিরা একটি সংকর জাতি হিসেবে পরিচিত। বাঙালির দেহ বৈশিষ্ট্যের দিকে তাকালে তা ধরা পরে। দেহের বিভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন নরগোষ্ঠীর পরিচয় বহন করে। তবে এসব জাতি গোষ্ঠীতে সংস্কৃতিতে, চিন্তাচেতনায়, বিশ্বাসে এই মূল্যবোধ গড়ে তুলেছে যে, বাঙালি জন একটি নতুন জাতি সত্তা যা উপমহাদেশের অন্য জনগোষ্ঠী থেকে আলাদা।

তিন.

মানুষের জীবনধারা ও ভূ-প্রকৃতির মধ্যে রয়েছে গভীর যোগসূত্র, সামগ্রিক জীবনযাত্রার উপর ভূ-প্রকৃতির প্রভাব সুস্পষ্ট। ভূ-প্রকৃতির কারণে কোথাও জীবনযাত্রা কঠিন আবার কোথাও সহজ। যেমন পার্বত্য অঞ্চলের জীবনযাত্রা কঠিন আবার সমতলে সহজ প্রকৃতির, আবার কোথাও জীবনযাত্রা নিম্নশ্রেণীর আবার কোথাও উন্নত প্রকৃতির। ভূ-প্রকৃতির কারণে সমতলে ঘনবসতি আর পার্বত্য অঞ্চলে বসতি কম দেখা যায়। ভূ-প্রকৃতির দ্বারা মানুষের চরিত্র গঠিত হয়। চরিত্র গঠনে ভূ-প্রকৃতি সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে। যেমন বাংলাদেশের পাহাড়ি অঞ্চলের বাসিন্দারা কঠোর পরিশ্রমী ও কষ্টসহিষ্ণু প্রকৃতির হয়। অন্যদিকে সমতলের লোক অলস ও আরামপ্রিয় হয়। আবার উষ্ণ জলবায়ু হলে সে অঞ্চলের লোকের মেজাজ রুক্ষ প্রকৃতির হয়ে থাকে। ভূ-প্রকৃতির কারণে জীবন জীবিকা বিপরীতমুখী হয়ে থাকে। বাংলাদেশে সমতল ও পাহাড়ি অঞ্চলের জীবিকা ভিন্ন প্রকৃতির দেখা যায়। সমতল ভূমি উর্বর হওয়ায় সহজে ফসল ফলে। অন্যদিকে পাহাড়ি অঞ্চলে সহজে ফসল ফলে না, তাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হয়।

ব্যবসা বাণিজ্যের উপর ভূ-প্রকৃতির প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। কারণ ভূ-প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সমতল ও পাহাড়ি অঞ্চলের মধ্যে অপেক্ষাকৃত তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। ভূ-প্রকৃতির কারণে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যাভ্যাস দেখা যায়। পাহাড়ি অঞ্চলের লোকেরা বনের মধ্য থেকে সংগ্রহ করে বিভিন্ন প্রকার খাবার। অন্যদিকে সমতলের লোক উৎপাদিত কৃষিসামগ্রী ভোগ করে।

যোগাযোগ ব্যবস্থা ভূ-প্রকৃতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বাংলাদেশ নদী মাতৃক হওয়ায় এখানকার নিম্ন এলাকার যোগাযোগের মাধ্যম হলো নৌকা, লঞ্চ, স্টিমার। সমতল অঞ্চলে সৃষ্টি হয়েছে কাঁচা পাকা রাস্তা যা যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সহজীকরণ করেছে। আবার পাহাড়ি অঞ্চল সমতল না হওয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত।

মানুষের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড গড়ে ভূ-প্রকৃতি দ্বারা। বাংলাদেশের সমতল ভূমির মানুষেরা সংস্কৃতির চর্চা বেশি করে থাকে। পাহাড়ি ও সমতল ভূমির লোকদের মধ্যে ভূ-প্রকৃতির বা সংস্কৃতি ও কৃষ্টির ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়।

ভূ-প্রকৃতি শিক্ষার উপর প্রভাব বিস্তার করে। সমতলের বাসিন্দারা বেশি করে সাহিত্য ও কলা, বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা করতে পারে। পাহাড়ি অঞ্চলের বাসিন্দারা সাহিত্য কলা গবেষণার সব সুযোগ পায় না। এছাড়া শীতল ও নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের জলবায়ু শিক্ষার প্রতিকূলে প্রভাব বিস্তার করে।

শিল্পায়নের উপর ভূ-প্রকৃতির প্রভাব সুস্পষ্ট। সাধারণত নদীর তীরে শিল্প কল কারখানা গড়ে ওঠে। নগরায়ণের বিস্তার ঘটে সমুদ্র ও নদী তীরবর্তী স্থানে। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত।

এছাড়া নারায়ণগঞ্জ শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে অবস্থিত। চট্টগ্রাম নগর বঙ্গোপসাগরের তীরে অবস্থিত। তাই বলা যায় নাগরায়নে ভূ-প্রকৃতির প্রভাব ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ।

ভূ-প্রকৃতির কারণে জেদ-হিংসা-প্রতিহিংসা অপরাধ বোধ জাগে। বাংলাদেশের পার্বত্য অঞ্চলে অপরাধ প্রবণতার হার বেশি। অন্যদিকে সমতল অঞ্চলে অপরাধ প্রবণতা কম। এছাড়া ভূ-প্রকৃতির কারণে নগরে

বেশি মাত্রায় অপরাধ সংগঠিত হয়। ভূ-প্রকৃতির কারণে ভাষাগত প্রভাব দেখা যায়। বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন বৈচিত্র্যময় ভাষা দেখা যায়। বাংলাদেশের সমতল ভূমির ভাষা হলো বাংলা। অন্যদিকে পাহাড়ি বিভিন্ন উপজাতি নিজস্ব ভাষায় কথা বলে। ভাষাকে কেন্দ্র করে ১৯৫২ সালে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তা বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূল প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল। বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতির প্রভাব দ্বারা এদেশের জনগণ গভীরভাবে প্রভাবিত। সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়সহ সমগ্র কর্মকাণ্ড ভূ-প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল।

চার.

বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি একটি ঐতিহাসিক বিবর্তনের মাধ্যমে বর্তমান রূপ লাভ করেছে। প্রাচীনকালে বাংলা নামে কোনো নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ছিল না। গৌড়, রাঢ়, পুণ্ড্র, হরিকেল, সমতট প্রভৃতি জনপদের সমষ্টি ছিল বাংলা। সর্ব প্রথম ঋগ্বেদের 'ঐতরেয় আরণ্যক' এ বঙ্গ নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া মহাভারত, রামায়ণ এবং কালীদাসের রঘু বংশ এ 'বঙ্গ' নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। সমগ্র বাংলা বঙ্গ নামে ঐক্যবদ্ধ হয় পাঠান আমলে। এছাড়া জটাপদে বাঙালিদের বাঙাল বলে উল্লেখ করেছে। বাংলা নামের উৎপত্তি আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া যায়। কাজেই বিভিন্ন বিদেশি শাসকগণ বিভিন্ন সময় বাংলা শাসন করেছে। ফলে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এক বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি সৃষ্টি করেছে।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থা বৈচিত্র্যময়। নিম্নে ভৌগোলিক অবস্থানের আলোকে বিভিন্ন যুগে বাংলার অবস্থান দেওয়া হলো—

১. ১০০০ খ্রিঃ পূর্ব থেকে ৭০০ খ্রিঃ পূর্বে বাংলার অবস্থান : বাংলার সর্ব প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ঋগবেদের ঐতরেয় আরণ্যকে। তখন বাংলার একটি নিদিষ্ট ভৌগোলিক এবং এর অধিবাসীদের নির্দিষ্ট নৃতাত্ত্বিক পরিচয় ছিল। এসব অঞ্চলে আর্যদের বসবাস ছিল উত্তর ও পশ্চিম ভারতে। প্রাক আর্যদের সময়ে বঙ্গের বেশির ভাগ অঞ্চল ছিল অরণ্য ভূমি। অরণ্যময় থাকার কারণে আর্য মুক্ত ছিল। বঙ্গ ও পুণ্ড্র বিখ্যাত জনপদ হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

২. মধ্য যুগে বাংলার অবস্থান : (৫৬০-৩২৫ খ্রি.পূর্ব) প্রাচীনকালে মধ্যভারতে অনেকগুলো রাজনৈতিক শক্তির বিকাশ ঘটে। কতকগুলো রাজনৈতিক অবস্থান যেমন– অঙ্গ, পুণ্ড্র, সুক্ষ্ম এবং বিশেষ করে বঙ্গ বিকাশের সাথে সাথে প্রাগৈতিহাসিক রাজ্যের উত্থান ঘটে। অঙ্গ ও পুণ্ড্রের ব্যাপক অংশ এবং বঙ্গের বেশকিছু অংশ মগধ রাজ্যভুক্ত হয়। গাঙ্গেয় নদী মালায় নৌপথকে কেন্দ্র করে বাংলার জনপদের বিকাশ ঘটে। এ সময় বৌদ্ধ ধর্মের বিকাশ লাভ করে বাংলা অঞ্চলে।

৩. কুষান যুগে বাংলার অবস্থান (৩০০ খ্রিঃ পূর্ব - ১০০ খ্রিষ্টাব্দে) : ৩০০ খ্রি. পূ. থেকে ১০০ শতকের মধ্যে এশিয়ায় আগমন করে যাযাবর ভিত্তিক কুষানগণ। আর্য সভ্যতার সংস্পর্শে আসে এ কুষানগণ। উত্তর ভারতের উন্নত সংস্কৃতির সাথে মিশে এই জাতি উত্তর ভারতের গঙ্গা নদী বরাবর ব্যাপক এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং রাজশক্তি গড়ে তোলে।

৪. গঙ্গারিডই : আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণকালে বাংলায় গঙ্গারিডই নামে এক শক্তিশালী ও সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ছিল। পণ্ডিতদের ধারণা গঙ্গা নদীর যে দুটি ধারা ভাগীরথী ও পদ্মা নামে পরিচিত এর মধ্যবর্তী স্থানে গাঙ্গারিডই জাতির লোক বসবাস করতো। এ রাজ্যের রাজধানী ছিল বঙ্গ নামে একটি বন্দর নগর।

৫. রাজা শশাঙ্ক এর বাংলা : প্রাচীনকালে এ দেশকে বঙ্গ নামে অভিহিত করা হত। গুপ্ত সম্রাজ্য পতনের পর বঙ্গদেশ দুটি স্বাধীন অংশে বিভক্ত হয়। প্রাচীন বঙ্গ রাজ্য গৌড়। দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলার রাজধানী ছিল বঙ্গ রাজ্য এবং বাংলার পশ্চিমাংশ ও উত্তরাংশ হয়েছিল গৌড়। গৌড়ের প্রথম স্বাধীন সার্বভৌম রাজা হয়েছিলেন শশাঙ্ক। তিনি প্রথম বাঙালি রাজা।

৬. পরিব্রাজকদের দৃষ্টিতে বাংলার অবস্থান : ফা-হিয়েন, ইবনে বতুতা, হিউয়েন সাং, মা-হুয়ান, নিকল দ্য ফন্টি ফেইসিন, হযরত শাহ জালাল প্রমুখ পরিব্রাজক বাংলার অবস্থান, সংস্কৃতি ও রাজ্য সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেন।

৭. পাল যুগে বাংলা (৭৫৬-৭৮১ খ্রি:) : গোপাল ছিলেন পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ছিলেন উত্তর বঙ্গের একজন শক্তিশালী রাজা। ধর্ম পাল ছিলেন শ্রেষ্ঠ পাল রাজা। তিনি বাংলা থেকে পাঞ্জাবের জলন্ধর পর্যন্ত সমগ্র

উত্তর ভারতে রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহার, সোমপুর বিহার তিনি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি বিক্রমশীলা বিহারও প্রতিষ্ঠা করেন।

৮. সেন যুগের বাংলা : সামন্ত সেনের পুত্র হেমন্ত সেন রাঢ় অঞ্চলে সেনরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তার পুত্র বিজয় সেন রাজ্যকে সাম্রাজ্যে পরিণত করেন। বিজয় সেন সর্ব প্রথম বাংলাকে একক শাসনাধীনে আনায়ন করেন। তার দ্বিতীয় রাজধানী ছিল বিক্রমপুর।

৯. বাংলার মুসলিম শাসন : বাংলায় মুসলিম শাসন শুরু হয় ১২০৪ থেকে ১২০৫ খ্রিষ্টাব্দে বখতিয়ার খিলজীর মাধ্যমে। তিনি বাংলায় মুসলিম শাসনের সূচনা করেন। ১৩৩৮ খ্রিষ্টাব্দে ফখরুদ্দীন মুবারক শাহ সোনার গাঁয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১৩৪২ খ্রিষ্টাব্দে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ত্রিপুরা, নেপাল, উড়িষ্যা বারানসী জয় করেন এবং ১৩৫২ খ্রিষ্টাব্দে পূর্ব বঙ্গ জয় করে উভয় বঙ্গ একত্রিত করেন। তিনি এ ভূ-খণ্ডের নামকরণ করেন মূলক-ই-বাঙ্গলাহ।

১০. মুঘল আমলে বাংলা : মুঘল আমলে বাংলা ছিল বৈচিত্র্যময়। সর্বপ্রথম বাংলার বার ভূঁইয়ারা মুঘল শাসন মেনে নেয়নি। ফলে তারা অনেক সময় স্বাধীন থেকেছে। ১৮ শতকের শেষের দিকে আওরঙ্গজেবের শাসনামলে এ সম্প্রসারণের চূড়ান্ত পর্যায় ঘটে। বাংলার শাসকগণ মুঘল সাম্রাজ্যের শাসনের বশ্যতা স্বীকার করে সুবাহ বাঙলা হিসেবে অঞ্চলটি নিরাপত্তা লাভ করে। বাঙলা যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমে ১৬১২ খ্রিষ্টাব্দে এবং পুনরায় ১৬৬১ খ্রিষ্টাব্দে কুচবিহার এবং ১৬১২-১৩ খ্রিষ্টাব্দে অহোম ও আসাম পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। দক্ষিণে উত্তর উড়িষ্যা পর্যন্ত বাংলার সীমান্ত ছিল।

১১. ইউরোপীয়দের আগমনের সময়ে বাংলা : ইউরোপীয়রা ভারত বর্ষে আগমন করে ব্যবসা বাণিজ্য করার লক্ষ্যে পর্তুগীজ, ফরাসি ডাচ ও ইংরেজরা আগমন করে উপমহাদেশে তাদের কর্মকাণ্ড বাণিজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলে লিপ্ত হয়। ব্রিটিশ ভূ-জরিপবিদ জেমস রেনেল সর্বপ্রথম ভারতের মানচিত্রে বাংলাকে বেঙ্গল বলে চিহ্নিত করেন। এ মানচিত্রে বেঙ্গলের বিস্তৃতি পশ্চিমে অযোদ্ধার সীমান্তবর্তী বেনারস এবং বিহার থেকে পূর্বে নিম্ন আসাম ও সিলেট এবং উত্তরে নেপাল ও ভূটান সীমান্ত থেকে দক্ষিণে উত্তর উড়িষ্যার নিকট মেদিনিপুর এবং বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত।

১২. ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে বাংলা : ব্রিটিশরা বাংলার সিংহাসন দখলের প্রচেষ্টা শুরু করে। তারা বাণিজ্য করার পাশাপাশি রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের পথ প্রশস্ত করে। ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের মাধ্যমে ব্রিটিশ ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার শাসন ক্ষমতা লাভ করে এবং ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দে বাংলার দিওয়ানী লাভ করে।

১৩. ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দের বাংলা : সিপাহি বিদ্রোহের পর ভারতের শাসন ব্যবস্থা ব্রিটিশ রাজ্যের কাছে চলে যায়। বাংলার একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থায় বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি তৈরি করা হয়।

১৪. ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দের বাংলা : রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সংস্কারে ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দের বাংলার বিভক্তি ও পুনর্গঠন হয়। পূর্ব বাংলা ও আসাম নিয়ে গঠিত হয় নতুন প্রদেশ। এর নাম হয় পূর্ব বাংলা ও আসাম।

১৫. ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা : ভারত বিভক্তির ফলে কংগ্রেসের আন্দোলনের মুখে ১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে পূর্ব বাংলা ও আসাম এবং পশ্চিম বঙ্গ একত্রীভূত হয়।

১৬. ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের বাংলা : লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে দ্বিজাতি তত্ত্বের উপর ভর করে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তান ছিল পূর্ব বাংলা। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত পূর্ব বাংলা ছিল পাকিস্তানের একটি প্রদেশ পূর্ব পাকিস্তান।

১৭. বর্তমান স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ : দীর্ঘ ৯ মাস ধরে যুদ্ধ করে অবশেষে উদিত হয় বাংলার স্বাধীনতার সূর্য। পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর দমন, নির্যাতন, বৈষম্যের বিরুদ্ধে বাংলার মানুষ গণ আন্দোলন গড়ে তোলে। তার চূড়ান্ত পরিণতি হয় ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরে, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ অর্জিত হয়।

পাঁচ.

১৯৪৭ সালে ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে ব্রিটিশ শাসনের অবসান হলে ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। তখন অবিভক্ত বাংলা বিভক্ত হয়ে এ দুই রাষ্ট্রের সাথে যুক্ত হয়। বর্তমান বাংলাদেশ পূর্ব বাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তান নামে পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হয়। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর প্রায় ২৩ বছরের শাসন শোষণ নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে অবশেষে বাঙালিরা সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৭১ সালে পরম

কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা লাভ করে। অবিভক্ত বাংলার প্রেক্ষিতে বর্তমান বাংলাদেশের স্বকীয় সত্তা অর্জন হয়। বর্তমান বাংলাদেশের যে স্বকীয় সত্তা বিরাজ করছে নিম্নে তা আলোচনা করা হলো :

১. রাষ্ট্রভাষা বাংলা : ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে বিক্ষোভ, সমাবেশের মাধ্যমে বিদ্রোহ করেই বাংলা ভাষা তার স্থান দখল করে নিয়েছে। তাই ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেছেন, এ বিদ্রোহ অভিজাত তন্ত্রের বিরুদ্ধে জনগণের জয়। আর সেই সাথে বাংলা বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মর্যাদা লাভ করেছে।

২. গণতান্ত্রিক ধারার বিকাশ : স্বাধীনতার পর বর্তমান বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিস্তার পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ভিন্নমত সহ্য করেনি। তারা জনগণের মতামত ছাড়াই নিজেদের ইচ্ছা মতো দেশ পরিচালনা করে বাঙালির অধিকার হরণ করে। তাই পাকিস্তান শাসনামল বাঙালিদের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করতে হয়েছে। তৎকালীন সামরিক শাসনে গণতান্ত্রিক ধারা বাধাগ্রস্থ হলেও বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক ধারার অনেক বিকাশ ঘটেছে।

৩. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি : স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্ম নিরপেক্ষতা স্থান পেয়েছে। জনগণও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য ধর্ম নিরপেক্ষতার চর্চায় ব্রতী। ধর্ম বর্ণ-নির্বিশেষে তারা এখন প্রকাশ্যে কারো ধর্ম বর্ণের বিরুদ্ধে মন্তব্য করাকে মানবতাবিরোধী ও রুচিবিহীন বলে মনে করে।

৪. বৈষম্যমূলক শিক্ষা : পাকিস্তান আমলে তিন ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি চালু ছিল। যেমন অভিজাত বা ধনী পরিবারের সন্তানেরা অভিজাত ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়ত। মধ্যবিত্তের সন্তানেরা পড়ত বাংলা মাধ্যম স্কুলে এবং দরিদ্র ঘরের সন্তানেরা পড়ত মাদ্রাসায়। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা ছিল ধর্ম নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দেশে শিক্ষা পদ্ধতির মাধ্যম হবে বাংলা। ৭২ এর সংবিধানে সেই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল এবং একই সুপারিশ ছিল কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টেও। কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থা মোটেও বদলায়নি বরং শ্রেণি বৈষম্য প্রবলতর হয়েছে।

৫. খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন : পাকিস্তানি শাসনামলে সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা কৃষি প্রধান পূর্ব বাংলায় খাদ্য ঘাটতি ছিল। স্বাধীনতা

উত্তরকালের চেয়ে বর্তমানে লোকসংখ্যা বেড়েছে দ্বিগুণ। বর্ধিত জনসংখ্যার কারণে বসতবাড়ি, অফিস আদালত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির চাহিদা পূরণে আবাদি জমির পরিমাণ অনেক কমে গেছে। তবুও সেখানে কৃষি উৎপাদন বাড়িয়ে আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করছে। যদিও বিদেশি প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শিল্পপণ্যের চাহিদায় এখানে সমতা আনা সম্ভব হয়নি।

৬. উদার মানসিকতা সৃষ্টি : বর্তমানে বাংলাদেশের উদার নৈতিকতা বৃদ্ধি পেয়েছে, এখানে সবাই সমান এবং যে যার অবস্থান থেকে ভালো করে চলার চেষ্টা করেছে। সমাজ আজ বাংলা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ধারণ করেছে শুধু তাই নয় সমাজ এখন ইউরোপীয় বিভিন্ন সংস্কৃতির সাথে মিশে নতুন নতুন আচার-আচরণে অভ্যস্ত হচ্ছে। এসব সম্ভব হয়েছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কারণে।

১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে দীর্ঘ ৯ মাসের সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম হয়। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ১০ জানুয়ারি বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা, স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন। জীবন-মৃত্যুর ভয়ঙ্কর অধ্যায় পার হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে মহান এ নেতার প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে পূর্ণতা পায় মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের বিজয়।

১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামীলীগ পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত হলেও পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে ষড়যন্ত্র শুরু করে। ফলে বঙ্গবন্ধু অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। এক পর্যায়ে বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনার আড়ালে পাকিস্তানের সামরিক জান্তা সামরিক অভিযানের প্রস্তুতি নিতে শুরু করে। নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জনের পরও পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর ক্ষমতা হস্তান্তরে অনীহার কারণে বাংলার মুক্তিকামী মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু ঘোষণা দিয়েছিলেন, 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। বঙ্গবন্ধুর এ ঘোষণার পর ২৫ মার্চ কালরাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির উপর অতর্কিত হামলা চালায়। এ ঘটনার পরই ১৯৭১ সালের ২৬

মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে সর্বস্তরের জনগণকে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান। স্বাধীনতা ঘোষণার অব্যবহিত পরই পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নির্দেশে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। মুজিবকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়ার পর ফয়সালাবাদের একটি জেলে কড়া নিরাপত্তায় রাখা হয়। পাকিস্তানি জেনারেল রহিমুদ্দিন খান মুজিবের মামলা পরিচালনা করেন। মামলার আসল কার্যপ্রণালি এবং রায় কখনোই জনসমাজে প্রকাশ করা হয়নি। এ মামলাটি লায়ালপুর ট্রায়াল হিসাবে অভিহিত। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর পরিচালিত অভিযান অল্প সময়ের মধ্যেই হিংস্রতা ও তীব্র রক্তপাতে রূপ নেয়। রাজাকারদের সহায়তায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাঙালি বুদ্ধিজীবি, রাজনীতিবিদ ও ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দসহ সাধারণ মানুষকে আক্রমণ করে। বাঙালি ও হিন্দুদেরকে লক্ষ্য করে বিশেষ অভিযানের কারণে সারা বছর জুড়ে প্রচুর হিন্দু জনগোষ্ঠী সীমান্ত অতিক্রম করে পার্শ্ববর্তী পশ্চিম বঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরায় আশ্রয় গ্রহণ করে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে ও পুলিশ রেজিমেন্টে কর্মরত পূর্ব বাংলার সদস্যবৃন্দ দ্রুত বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং লীগ সদস্যবৃন্দ কলকাতায় তাজউদ্দিন আহমেদের নেতৃত্বে প্রবাসে বাংলাদেশ সরকার গঠন করে। পূর্ব পাকিস্তানে মুক্তিবাহিনীর নেতৃত্বে বড় রকমের বিদ্রোহ সংঘঠিত হতে থাকে।

আন্তর্জাতিক চাপ থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তানি সরকার মুজিবকে ছেড়ে দিতে এবং তাঁর সাথে সমঝোতা করতে অস্বীকৃতি জানায়। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে মুজিবের পরিবারকে গৃহবন্দি করে রাখা হয়। তাঁর সন্তান শেখ কামাল মুক্তিবাহিনীর একজন গুরুত্বপূর্ণ অফিসার ছিলেন। মুক্তি বাহিনী ও পাকিস্তান বাহিনীর ভিতরে সংঘঠিত যুদ্ধটিই বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ নামে পরিচিত। ১৯৭১ সালে ভারতীয় সরকারের অংশগ্রহণের পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনী, মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত যৌথ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে এবং আওয়ামী লীগ নেতৃত্ববৃন্দ ঢাকায় ফিরে আসেন। বঙ্গবন্ধু ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে সাক্ষাতের পর জনসমক্ষে ভারতের জনগণ আমার জনগণের শ্রেষ্ঠ বন্ধু বলে তাদেরকে সাধুবাদ জানান। তিনি ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বাংলাদেশে ফিরে আসেন। ঢাকায় মহান নেতাকে জানানো হয় অভূতপূর্ব অভিনন্দন। এভাবে

ভালোবাসায় সিক্ত হলেন বঙ্গবন্ধু। নিজে কাঁদলেন, জনতাকেও কাঁদালেন। অবিসংবাদিত নেতার প্রতি জনগণের আবেগময় অভিনন্দন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। পুরাতন বিমান বন্দর থেকে রমনা রেসকোর্স ময়দান পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ জনতা উপস্থিত হয় প্রিয় নেতাকে এক নজর দেখার জন্য। রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু তাঁর বক্তৃতায় সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রের আশুকরণীয় ও নীতিনির্ধারণী বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন, নবীন রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের স্বীকৃতি এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রকৃতি সম্পর্কে তিনি স্পষ্ট বক্তব্য দেন। তিনি বলেন 'বাংলাদেশ একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে'। আর তার ভিত্তি বিশেষ কোনো ধর্মীয় ভিত্তিক হবে না। রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা।

অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যখন ঢাকায় আসেন তখন আনন্দে আত্মহারা লাখ লাখ বাঙালি তাকে স্বতঃস্ফূর্ত সংবর্ধনা জানায়। সেইদিন বিকাল ৫ টায় রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) প্রায় ১০ লক্ষ মানুষের উপস্থিতিতে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম ভাষণ দেন। এই ভাষণে বঙ্গবন্ধু সশ্রদ্ধচিত্তে সবার ত্যাগের কথা স্মরণ করে মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান।

ছয়.

১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। কিন্তু কয়েক বছর যেতে না যেতেই ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট সেনাবাহিনীর এক ক্ষুদ্র অংশের বিপথ গামী অফিসারদের অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তিনি সপরিবারে নিহত হন এবং তাঁর শাসনামলের অবসান ঘটে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নির্মমভাবে সপরিবারে নিহত হলেও তাঁর সাড়ে তিন বছরের শাসনামলের বেশ কিছু সাফল্যের দিক প্রস্ফুটিত হয়ে আছে।

বঙ্গবন্ধুর শাসনামলের সফলতা : বঙ্গবন্ধু মাত্র সাড়ে তিন বছর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ স্বল্প সময়ের মধ্যেও তাঁর সাফল্য কম নয়। নিম্নে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তথা আওয়ামীলীগের শাসনামলের সাফল্যের দিকগুলো আলোচনা করা হলো :

১. সংবিধান প্রণয়ন : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সাফল্য হলো যুদ্ধবিধ্বস্ত বিশৃঙ্খল বাঙালি জাতিকে একটি সুশৃঙ্খল জাতিতে রূপান্তরিত করে মাত্র নয় মাসের মধ্যে একটি সর্বসম্মত প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান জাতিকে উপহার দেওয়া।

২. প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা : দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার প্রয়াসে আওয়ামীলীগ সরকার পরিকল্পিত উপায়ে দেশ গঠনের কাজে হাত দেন। এ প্রয়াসে হাতিয়ার হিসেবে দেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

৩. ভারতীয় বাহিনীকে স্বদেশে প্রেরণ : বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতীয় সেনাবাহিনী মুক্তি বাহিনীকে প্রত্যক্ষভাবে সহায়তা করেছিল। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর অনেকের ধারণা ছিল ভারতীয় বাহিনী সহজে বাংলাদেশ ছাড়বে না। কিন্তু বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত উদ্যোগের ফলে ১৯৭২ সালের ১২ মার্চ ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশ ত্যাগ করে।

৪. অর্থনৈতিক উন্নয়ন : সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশে ছিন্নমূল মানুষের সাহায্য ও পুনর্বাসন এবং কৃষি ও শিল্পের উন্নয়ন ছিল অত্যন্ত কঠিন কাজ। জন বহুল বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজটিও অত্যন্ত দুরূহ ছিল। বঙ্গবন্ধু তার দূরদর্শী নেতৃত্বের মাধ্যমে জাতিসংঘের সাহায্য সংস্থার সহায়তায় ভয়াবহ বিপর্যয় দূর করে অর্থনৈতিক উন্নয়নে সক্ষম হন।

৫. অস্ত্র জমাদানে বাধ্য করা : স্বাধীনতা উত্তরকালে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের এবং বিপক্ষের অনেকেই তাদের কাছে রক্ষিত অস্ত্র জমা দেয়নি। ফলে এ সময় আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে স্বাধীনতার সপক্ষের এবং বিপক্ষের অনেকেই অস্ত্র জমা দিতে বাধ্য হয়।

৬. বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সফল নেতৃত্ব ও পররাষ্ট্র নীতির ফলে বাংলাদেশ জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সদস্যপদ, জাতিসংঘের সদস্যপদ, ইসলামি সম্মেলন সংস্থার সদস্যপদ এবং বিদেশি প্রায় সকল রাষ্ট্রের স্বীকৃতি লাভে সক্ষম হয়।

৭. সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান : সংবিধান রচনার পর সংবিধানের বিধান মোতাবেক তাঁর সরকার ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন। এত অল্প সময়ের ব্যবধানে একটি সফল সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এক উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব।

৮. বাংলাদেশি মুদ্রার প্রচলন : স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে পাকিস্তানি ও ভারতীয় মুদ্রার প্রচলন ছিল। কিন্তু বঙ্গবন্ধু ব্রিটিশ সরকারের সহায়তায় নিজস্ব মুদ্রা প্রচলনের ব্যবস্থা করেন। পরবর্তীতে দেশে নিজস্ব টাকশাল গড়ে তোলা হয়।

৯. জাতীয়করণ নীতি : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলে বাংলাদেশে বহু মালিকানাবিহীন ও ব্যক্তি মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংক বীমা জাতীয়করণ করা হয়। এ ধরনের জাতীয়করণ নীতি ছিল মূলত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার পূর্বশর্ত।

১০. বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শাসন ভার গ্রহণ করার পর বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে স্বায়ত্তশাসন প্রদানের জন্যে এই আইন জারি করেন।

১১. ভূমি সংস্কার : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সরকার ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করেন। তিনি ১০০ বিঘার বেশি যাদের জমি তাদের সেই অতিরিক্ত জমি ভূমিহীন কৃষকের মধ্যে বন্টন করে দেয়ার বিধান করেন।

১২. যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশের বিধ্বস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থার পুনর্গঠন করেন। তিনি ভারত সরকার ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সহায়তায় বিধ্বস্ত রাস্তাঘাট, সেতু, কালভাট ও বিমান বন্দর পুনর্নির্মাণ করেন।

১৩. সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা : স্বাধীন বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখার লক্ষ্যে তিনি ধর্ম নিরপেক্ষতাকে অন্যতম রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেন। যার ফলে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান

সকল ধর্মের মানুষ বাংলাদেশে এক ও অভিন্ন সত্তা ও ভাই ভাই হিসেবে শান্তিতে বসবাস করছে।

১৪. বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতিকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করা : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই প্রথম বাঙালি যিনি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম ভাষণ প্রদান করেন। এর ফলে আন্তর্জাতিক বিশ্বে বাংলা ভাষা ও বাঙালি জাতির ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৫. পর রাষ্ট্রনীতির সাফল্য : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অতিদ্রুত সাফল্য লাভ করে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট পর্যন্ত বিশ্বের শতাধিক রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত সময়কালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গন ছিল সীমাহীন দুর্নীতি ও অস্থিরতায় পরিপূর্ণ। অর্থনৈতিক স্বল্পতার কারণে সরকার সাধ্যমতো কাজ করেও সুফল পায়নি। অপরদিকে স্বাধীনতা যুদ্ধে আত্মত্যাগকারী জনগণের সরকারের প্রতি প্রত্যাশা ছিল অনেক বেশি। চাওয়া পাওয়ার মধ্যকার এ ব্যবধান রাষ্ট্রীয় সংহতি ক্ষতিগ্রস্থ করে। তাছাড়া স্বাধীনতা বিরোধী চক্র এ সময় মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। বাংলাদেশকে একটি ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্যে ১ম ষড়যন্ত্র করা হয়। তাছাড়া অতিলোভী রাজনৈতিক নেতাদের দৌরাত্মও ছিল। সব মিলিয়ে একটা প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি হলে শেখ মুজিবের সামনে বিকল্প কোনো পথ ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন নিজের ক্ষমতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করে কঠোরভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে। এজন্য তিনি বাকশাল গঠন করেছিলেন। বাকশাল যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই গঠন করা হোক না কেন তা জনগণের কাছে পৌঁছে না। ফলে বাকশালের প্রতি জনগণের মনোভাব ছিল নেতিবাচক। দলীয় লোভী ও স্বার্থপর কতিপয় ব্যক্তির সীমাহীন ক্ষমতার দাপট ও দৌরাত্ম বাকশালের সঠিক রূপকে প্রতিফলিত হতে দেয়নি। অপরদিকে দেশি বিদেশি স্বাধীনতা বিরোধী মহলের চক্রান্ত তো ছিলই। বাকশালের কার্যক্রম ছিল মাত্র ৬ মাস। মুজিব সরকারের অবসানের সাথে সাথে বাকশালেরও অবসান ঘটে।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট বাঙালি জাতির পিতা, হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি ও স্বাধীন বাংলাদেশের রূপকার বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। যদিও সেনা বাহিনীতে চাকুরিরত ও বিভিন্ন সময় চাকুরিচ্যুত কিছু সেনা সদস্য কর্তৃক এ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। তারপরও এর সাথে মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত দেশি-বিদেশি শক্তি ও এদেশের প্রতিক্রিয়াশীল সহযোগী গোষ্ঠীর সংশ্লিষ্টতা ছিল বলে জানা যায়। মূলত এটি ছিল একটি ষড়যন্ত্রমূলক রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড যার ফলশ্রুতিতে একটি আদর্শিক পটপরিবর্তন সূচিত হয়।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যা ও তাঁর সরকারকে উৎখাতের পর তাঁরই মন্ত্রিসভার বাণিজ্যমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমেদ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা দখল করেন। তিনি জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করেন। তার ভাষণে তিনি মুসলিমবিশ্বসহ সকল দেশের সাথে সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহ প্রকাশ করেন। ক্ষমতায় আরোহণের পর তিনি যে মন্ত্রিসভা ঘোষণা করেন, এর অধিকাংশ সদস্যই বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রীসভার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ফলে প্রথম দিকে এটিকে আওয়ামীলীগের একটি অংশ কর্তৃক ক্ষমতা দখল বলে প্রচারের চেষ্টা করা হয়। সম্ভবত একই ধারণা প্রদানের উদ্দেশ্যে সংবিধান বহাল থাকে। জাতীয় সংসদে কিছুই বাতিল ঘোষিত হয়নি। তবে বাকশাল বা বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামীলীগ নামের রাজনৈতিক দলটি বাতিল ঘোষণা করা হয়। ক্ষমতাসীন মোশতাক সরকার প্রথমে দেশে সামরিক আইন জারি করেনি। তবে ২০ আগস্ট সামরিক আইন জারি করা হয়। মূলত ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের পর খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বে প্রতি বিপ্লবী শক্তি ক্ষমতায় আসীন হয়ে শাসন কাজ পরিচালনা করে।

ক্ষমতাসীন খন্দকার মোশতাকের নেতৃত্বাধীন সরকার সেনাবাহিনী থেকে তেমন জোরালো সমর্থন পায়নি। কেননা সেনাবাহিনী তাকে পুতুল রাষ্ট্রপ্রধান রেখে শাসন পরিচালনা করতে চেয়েছিল। এর ফলে দেশে পুনরায় অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। আর এই সুযোগে সেনাবাহিনীর চিফ অব দি জেনারেল স্টাফ ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ৩ নভেম্বর ১৯৭৫ সালে সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে মোশতাক সরকারকে উৎখাত করে। তিনি জেনারেল জিয়াকে গৃহবন্দি করে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমকে রাষ্ট্রপতি নিযুক্ত করেন। রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নেওয়ার পর

বিচারপতি সায়েম জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করেন। নভেম্বর মাসে সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ ও প্রতি-বিদ্রোহের সূচনা ঘটে এবং তৃতীয় বিশ্বের অধিকাংশ দেশের অনুসরণে এদেশে সামরিক শাসন তার চিরস্থায়ী আসন গেড়ে বসে। ৩ নভেম্বর ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারের অভ্যন্তরে আওয়ামীলীগের শীর্ষ স্থানীয় চার নেতাকে হত্যা করা হয়। নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ নাগাদ সেনাবাহিনী রাষ্ট্র শাসনের দায়িত্ব পুরোপরিভাবে নিজের হাতে তুলে নেয়। মওদুদ আহমেদ উল্লেখ করেছেন, 'বাঙালি জাতির রক্তক্ষয়ী দীর্ঘকালীন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত মূল্যবোধ ও নীতিসমূহকে অবদমিত করে জাতির ইতিহাসকে এক বিতর্কিত অধ্যায়ের দিকে ঠেলে দেয়া হয়। ক্ষমতার ক্রীড়াঙ্গনে আবার শুরু হয় ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত ও বিশ্বাসঘাতকতার মহাউৎসব'।

বাংলাদেশের ইতিহাসে ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ সাল একটি শোকাবহ ও দুঃখময় দিন। কেননা জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে দেশের রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতিসহ নানা ক্ষেত্রে এক আমূল আদর্শিক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। মওদুদ আহমেদের মতে 'অত্যন্ত দুঃখবহ এবং করুণ মৃত্যুবরণ করলেও বঙ্গবন্ধু একটি মুক্ত এবং স্বাধীন বাংলাদেশ এদেশের মানুষকে উপহার দিয়ে একটি নতুন জাতিসত্তা সৃষ্টি করে গেছেন। 'বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও শাসনকাল ১৯৭২-১৯৭৫' গ্রন্থে উপরে আলোচিত বিষয়সমূহ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়াস পাবো।

ড. মোহাম্মদ আখতার হোসেন
প্রফেসর ও সভাপতি
ফোকলোর বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সূ চি প ত্র

বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন ও শাসনকাল ১৯৭২-১৯৭৫

১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয় ঘটে। বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশের আবির্ভাব যেমন একদিকে সমগ্র বিশ্বের সহানুভূতি লাভ ও জনমনে আশার সঞ্চার করেছিল আমাদের স্বাধীনতা উত্তরকালে মুক্তিযুদ্ধের ঘোর বিরোধীকারী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার মতব্য করেছিলেন বাংলাদেশের অর্থনীতি তলাবিহীন ঝুড়ি। কিন্তু সময়ের পরিক্রমায় এক কথায় ভুল প্রমাণিত হয়েছে। বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে। বর্তমানে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে পরিণত হয়েছে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হবে।

স্বাধীনতা উত্তরকালে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীতে মুক্তিযোদ্ধা বনাম পাকিস্তান প্রত্যাগতদের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এখানে উল্লেখ্য যে, ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর সদস্য সংখ্যা ছিল ৪৫০০০ হাজার। তন্মধ্যে পাকিস্তান থেকে প্রত্যাগতদের সংখ্যা ছিল ২৮০০০।[১] এভাবে সেনাবাহিনীতে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। এমনি এক বাস্তবতায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এরপর যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি দেশে ফিরে ১১ জানুয়ারি দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সম্পূর্ণভাবে শত্রুমুক্ত হয় এবং চূড়ান্ত বিজয় সূচিত হয়। তারপর বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করে দেশের প্রকৃত শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করেন। কিন্তু প্রবাসী সরকারের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান তখনও পাকিস্তান সরকারের কারাগারে অন্তরীণ ছিলেন। তাই মনে হচ্ছিল যেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা পূর্ণতা পায়নি। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারিতে তিনি মুক্ত হয়ে স্বদেশের মাটিতে পা রাখেন। তাঁর এ প্রত্যাবর্তন বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে পূর্ণতা

দান করে; দেশ ফিরে পায় তাঁর প্রাণপ্রিয় নেতা ও প্রতিষ্ঠাতা শেখ মুজিবকে। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর থেকে জনগণের মনে শক্তি ও সাহসের সঞ্চার হয়। যুদ্ধ শেষে খুব বড় ঘটনা পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে শেখ মুজিবের স্বদেশ প্রত্যার্তন। পাকিস্তানি সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান ১৯৭২ সালের ৮ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেন। ১০ জানুয়ারি তিনি যখন ফিরছিলেন তখন বিমানের জানালা দিয়ে জনসমুদ্র দেখছিলেন। তিনি দেখে অভিভূত হয়ে কেঁদে ফেলেন। সাংবাদিক আতাউস সামাদ বিমানে ছিলেন পাশের আসনেই। তিনি শুনলেন, শেখ মুজিবুর রহমান বলছেন, 'এত মানুষ! ওরা আমাকে এত ভালোবাসে! কিন্তু আমি ওদেরকে খাওয়াবো কি করে'।[২] ওই অনুভূতিটি সেদিন খুবই স্বাভাবিক ছিল। ঢাকায় সে দিন অনেকেই সমবেত হয়েছিল, আরো অনেকে আসতে পারেনি। কিন্তু তাদের প্রত্যাশাও ছিল যাওয়ার।

স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পরদিন অর্থাৎ ১১ জানুয়ারি (১৯৭২) রাষ্ট্রপতি এক আদেশের মাধ্যমে বাংলাদেশ অস্থায়ী সাংবিধানিক আদেশ (Provisional Constitutional order of Bangladesh) জারি করেন। শুরু করেন যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনের কাজ। তিনি স্বাধীনতার মাত্র এক বছরের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর জাতিকে একটি উত্তম সংবিধান উপহার দিতে সক্ষম হন। ভারত তার স্বাধীনতার আড়াই বছর (১৯৫০ সালে) পর এবং পাকিস্তান দীর্ঘ ৯ বছর (১৯৫৬ সালে) পর জাতিকে সংবিধান উপহার দিতে পেরেছিল। কিন্তু স্বাধীনতাবিরোধী চক্র মুজিবের এ সাফল্য সাদরে গ্রহণ করতে পারেনি। ফলশ্রুতিতে তার বিরুদ্ধে শুরু হয় ষড়যন্ত্র। এই ষড়যন্ত্রে নিজ দলের বিপথগামী নেতারাও ছিলেন। যার নির্মম পরিণতিতে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর পরিবারের বেশিরভাগ সদস্যসহ নিহত হন।

১.১. বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন

১. পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্তিলাভ ও লন্ডন যাত্রা : পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বাংলাদেশের বিজয়ের পর পাকিস্তানের পরাজয়ের গ্লানি মাথায় নিয়ে ১৯৭১ সালের ১৯ ডিসেম্বর পদত্যাগ করেন এবং পাকিস্তান পিপলস পার্টির চেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভুট্টোর নিকট

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পদের দায়িত্বভার অর্পণ করেন। ভুট্টো যুগপৎ সামরিক আইন প্রশাসক ও রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা গ্রহণ করেন। ক্ষমতা হস্তান্তরকালে ইয়াহিয়া খান মুজিবকে হত্যার জন্য ভুট্টোকে পরামর্শ দেন। তিনি দুঃখ ও ক্ষোভে ভুট্টোকে বলেন, 'মুজিবকে ফাঁসি না দেওয়াটা আমার জীবনে মারাত্মক ভুল হয়েছে'। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে তখনো পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর প্রায় ৯৪,০০০ সৈনিক যুদ্ধবন্দি এবং বেসামরিক বাসিন্দাদের জীবন নাশের আশঙ্কায় ভুট্টো ইয়াহিয়ার প্রস্তাবে রাজি হননি। ভুট্টো ইয়াহিয়াকে বলেন আমি যদি এক মুজিবকে ফাঁসি দেই তবে পূর্ব পাকিস্তান থেকে একজন পশ্চিম পাকিস্তানিও ফিরে আসবে না।

১৯৭১ সালের ২৬ ডিসেম্বর জুলফিকার আলী ভুট্টো বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তানের মিনওয়ালী কারাগার থেকে মুক্তি দিয়ে সিহালা অতিথি ভবনে নিয়ে যান এবং বঙ্গবন্ধুর সাথে আলোচনায় বসেন। পরিশেষে ৭ জানুয়ারি দিবাগত রাত্রে অর্থাৎ ৮ জানুয়ারি করাচি বিমান বন্দরে পূর্ব থেকেই প্রস্তুত রাখা একটি চার্টার্ড বিমানে বঙ্গবন্ধুকে তুলে দেন। যদিও বঙ্গবন্ধুর মুক্তির ব্যাপারটি এবং বিমানে তুলে কোন দেশে পাঠানো হচ্ছে সেই ব্যাপারটি পাকিস্তান সরকার সম্পূর্ণ গোপন রেখেছিলেন। বিমানটি করাচি বিমান বন্দর ত্যাগ করার পরপরই পাকিস্তান রেডিও থেকে ঘোষণা করা হয় যে, শেখ মুজিবকে পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্তি দেয়া হয়েছে। ৮ জানুয়ারি ১৯৭২ বিবিসির সকালের সংবাদে জানানো হয় যে, পাকিস্তান সরকার শেখ মুজিবকে ৭ জানুয়ারি দিবাগত ভোর রাতে অর্থাৎ ৮ জানুয়ারি করাগার থেকে মুক্ত করে একটি চার্টার্ড বিমানে লন্ডনের পথে পাঠিয়ে দেন। এই খবরটি মুহূর্তের মধ্যে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বব্যাপী এক আলোড়ন সৃষ্টি হয়। বিমানটি বিকালের দিকে লন্ডনের হিথ্রো বিমান বন্দরে অবতরণ করে। লন্ডনে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস থেকে কর্মকর্তাগণ ছুটে আসে বঙ্গবন্ধুকে স্বাগত জানাতে। হিথ্রো বিমান বন্দরের ভিআইপি লাউঞ্জে ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ও কমনওয়েলথ অফিসের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। যুক্তরাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও বিমান বন্দরে ছুটে আসেন। বিমান বন্দর থেকে বাংলাদেশ মিশনের কর্মকর্তাগণ বঙ্গবন্ধুকে লন্ডনের বিখ্যাত ক্লারিজেস হোটেলে নিয়ে যান। তিনি হোটেলে এসে লন্ডনস্থ বাংলাদেশ ও ভারতীয় দূতাবাসের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করেন।

ক্লারিজেস হোটেলে অবস্থানকালে কমনওয়েলথ সেক্রেটারী জেনারেল আরন্ড স্মিথ এবং ব্রিটিশ প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন বঙ্গবন্ধুর সাথে তার হোটেলে দেখা করেন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্থ হিথ বঙ্গবন্ধুকে তার সরকারি বাসভবন ১০নং ডাউন স্ট্রীটে আমন্ত্রণ জনান। বঙ্গবন্ধু সেখানে গেলে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী নিজ হাতে গাড়ির দরজা খুলে দেন এবং অভ্যর্থনা জানান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিলাভের পরও জানতেন না যে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। ইংল্যান্ডে তিনি লাল গালিচা সংবর্ধনা লাভ করেন। এখানেই তিনি তার সমগ্র জীবনের সবচেয়ে সুখের দিনটি অতিবাহিত করেন এ সংবাদ শুনে যে, বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। বঙ্গবন্ধু যুক্তরাজ্যের সরকার ও জনগণের কাছে মাতৃভূমির মুক্তি সংগ্রামে তার দেশবাসীকে ও সংগ্রামী মুক্তিযোদ্ধাদের সব ধরনের সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য কৃতজ্ঞতা জানান।

২, ভারতে বঙ্গবন্ধু : যুক্তরাজ্য থেকে বঙ্গবন্ধু ভারতে আসেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বঙ্গবন্ধুকে ঐতিহাসিক সংবর্ধনা দান করেন। সংবর্ধনার জবাবে বঙ্গবন্ধু ভারতের প্রধানমন্ত্রী, তার সরকার এবং ভারতের সকল পর্যায়ের জনগণকে বাংলাদেশের মক্তি সংগ্রামে সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন।

৩. মুজিব নগর সরকারের ঢাকা প্রত্যাবর্তন : **২২ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে** মুজিব নগর সরকারের সদস্যবৃন্দ ঢাকায় আসেন। এর আগে ১৬ ডিসেম্বর পাকবাহিনীর আত্মসমর্পণের অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সচিব জনাব রুহুল কুদ্দুসের নেতৃত্বে মুজিবনগর সরকারের প্রশাসনের সিনিয়র আমলাবৃন্দ ঢাকায় এসে প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন। ঢাকায় পৌঁছে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ মন্ত্রীদের পদ পুনর্বিন্যস্ত করেন। তিনি খন্দকার মোশতাক আহমদকে আইন ও সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে বহাল রেখে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেন এবং জনাব আবদুস সামাদ আজাদকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব প্রদান করেন। এভাবে সরকারে বঙ্গবন্ধুর সবচেয়ে বড় নির্ভরতা জনাব তাজউদ্দীন আহমদের নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমতা সুদৃঢ় হয়। ঢাকায় পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার পর স্বাধীন বাংলাদেশের সরকার বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ও স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বিষয়টিকে সর্বাগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয় হিসেব কার্যসূচিভুক্ত করে এবং এজন্য প্রয়োজনীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে।

৪. ঢাকায় বঙ্গবন্ধু : ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি দুপুর ১ টা ৪৫ মিনিটে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বহনকারী ব্রিটিশ কমেট বিমানটি তেজগাঁও বিমান বন্দরের রানওয়ে স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে অভূতপূর্ব দৃশ্যের অবতারণা হয়। সব পাওয়ার আনন্দে সাড়ে সাত কোটি বাঙালি একসঙ্গে আনন্দে মেতে ওঠে। বিমান বন্দর থেকে রেসকোর্স ময়দান পর্যন্ত পাঁচ কিলোমিটার রাস্তা লোকে লোকারণ্য হয়ে ওঠে। তা এতটাই লোক বহুল ছিল যে এতটুকু পথ মোটর শোভাযাত্রাসহ অতিক্রম করতে বঙ্গন্ধুর দুঘণ্টার বেশি সময় লেগে যায়।

৫. রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু : ৭ মার্চ ১৯৭১ সালে রেসকোর্স ময়দান থেকে জাতিকে নির্দেশ দিয়েছিলেন ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার জন্য। যার যা কিছু আছে তা নিয়ে শত্রুকে মোকাবিলা করার জন্য। বাঙালি জাতি নেতার এ নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছে। ১০ জানুয়ারি, ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আবারো রেসকোর্স ময়দানে দাঁড়ালেন। এবারেও রেসকোর্স জনসমুদ্রে লোকসংখ্যা প্রায় ১০ লক্ষাধিক ছিল।

৬. রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে স্বদেশে ফিরে এসেছিলেন। কারণ ১০ এপ্রিল ১৯৭১ সালে গঠিত মুজিবনগর সরকারের তিনি রাষ্ট্রপতি ছিলেন। ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১ সালে মুজিবনগর সরকারের শপথ গ্রহণের আগে ঘোষিত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র বঙ্গবন্ধুর শাসনভার গ্রহণের সাংবিধানিক ভিত্তি তৈরি করে। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান কারাগারে বন্দি থাকলেও বঙ্গবন্ধু মুজিবনগর সরকারের প্রেসিডেন্ট পদে বহাল ছিলেন। সুতরাং ১০ জানুয়ারি তিনি প্রেসিডেন্ট হিসেবেই নিজ মাতৃভূমিতে প্রত্যাবর্তন করেন।

১.২.১. সংবিধান প্রণয়ন

১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল ঘোষিত স্বাধীনতার সনদ মুক্তিযুদ্ধকালীন বাংলাদেশে মৌলিক আইনের ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। এই সনদ ছিল আইনের মূল সূতিকাগার এবং সরকারের সমস্ত কর্তৃত্ব ক্ষমতার উৎস। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর দেশের সংবিধান কার্যকর না হওয়া পর্যন্ত এটিই ছিল দেশের সংবিধান।[৩] এ সনদে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার পদ্ধতির বিধান ছিল এবং শেখ মুজিবকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে দেশের শাসন পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনার ক্ষমতা দেয়া হয়েছিল। উক্ত ক্ষমতার বলে বঙ্গবন্ধু ঢাকা

প্রত্যাবর্তনের পরের দিন ১১ জানুয়ারি (১৯৭২) 'অস্থায়ী সংবিধান আদেশ' জারি করেন। অস্থায়ী সংবিধান আদেশে সংসদীয় সরকার পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়। এটি ছিল জনগণের প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর দৃঢ় প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন। ১৯৪৯ সালে জন্মলগ্ন থেকে আওয়ামী লীগ ছিল দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ১৯৫৪ সালের ২১ দফায়, ৬ ও ১১ দফায় এবং ৭০ এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংসদীয় পদ্ধতির দাবি করেছিল।

অস্থায়ী সংবিধান আদেশ বলে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে সরকার ১৯৭২ সালের ২৩ মার্চ গণপরিষদ আদেশ ও বাংলাদেশ গণপরিষদ সদস্যপদ বাতিল আদেশ নামক ২টি আদেশ জারি করে। প্রথমটির মাধ্যমে ১৯৭০ সালে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য সদস্যগণকে নিয়ে গণপরিষদ গঠন করা হয়। গণপরিষদের একমাত্র দায়িত্ব ছিল বাংলাদেশের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করা। আইনসভা হিসেবে কাজ করার কোনো ক্ষমতা গণপরিষদের ছিল না। এই আদেশটি ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ থেকে কার্যকর করা হয়। দ্বিতীয় আদেশ অনুযায়ী গণপরিষদের কোনো সদস্য তার রাজনৈতিক দল (অর্থাৎ যে দলের মনোনয়ন পেয়ে তিনি নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন) থেকে পদত্যাগ করেন কিংবা উক্ত দল থেকে বহিষ্কৃত হন তাহলে তার সদস্য পদ বাতিল হয়ে যাবে।[৪]

এ দুটি অধ্যাদেশ জারির পরপরই সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়। শেখ মুজিবুর রহমান ৯ এপ্রিল আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টি কর্তৃক গণপরিষদের দলীয় নেতা নির্বাচিত হন। সৈয়দ নজরুল ইসলামকে সহকারী নেতা নির্বাচন করা হয়। রাষ্ট্রপতি ১০ এপ্রিল গণপরিষদের অধিবেশন উদ্বোধন করেন। তার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শাহ আবদুল হামিদ ও মোহাম্মদ উল্লাহ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গণপরিষদের যথাক্রমে স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ৪১৪ জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের লক্ষ্যে ১১ এপ্রিল একটি কমিটি গঠন করা হয়। ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট এই কমিটির আহবায়ক ছিলেন ড. কামাল হোসেন। এই কমিটিতে একমাত্র বিরোধী দলীয় সদস্য ছিলেন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ন্যাপ (মোজাফফর) থেকে ১৯৭০ সালে প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত। কমিটিতে একজন মহিলা গণপরিষদ সদস্য (মোট মহিলা সদস্য সংখ্যা ছিল ৭ জন) অন্তর্ভুক্ত

করা হয়। কমিটিকে পরবর্তী ১০ জুনের (১৯৭২) মধ্যে গণপরিষদে সংবিধানের খসড়া উপস্থাপন করতে বলা হয়। সে অনুযায়ী কমিটি অত্যন্ত দ্রুত সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের কাজ শুরু করেন। ১৭ এপ্রিল কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। ঐ বৈঠকে দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও বিভিন্ন সংবিধান বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে সংবিধান বিষয়ে প্রস্তাব আহ্বান করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কমিটির ঘোষিত শেষ তারিখের (৮ মে, ১৯৭২) মধ্যে কমিটি ৯৮টি সুপারিশমালা লাভ করে। পূর্ব নির্ধারিত ১০ জুনের মধ্যে কমিটি সংবিধানের খসড়া প্রণয়ন করতে সক্ষম হয়। সংবিধানটিকে পূর্ণাঙ্গ ও উত্তম করার উদ্দেশ্যে কমিটির সভাপতি ড. কামাল হোসেন ভারত ও ইংল্যান্ড সফর করে সেখানকার পার্লামেন্টের কার্যকারিতা প্রত্যক্ষ করেন। তাছাড়া সংবিধানটিকে ত্রুটিমুক্ত করার উদ্দেশ্যে কমিটি একজন ব্রিটিশ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করে। ১৯৭২ সালের ১১ অক্টোবরের মধ্যে কমিটি সংবিধানের খসড়া চূড়ান্তভাবে প্রণয়ন করে। সংবিধানের খসড়া চূড়ান্ত করার পূর্বে ৯ অক্টোবর কমিটির প্রণীত চূড়ান্ত খসড়াটি সভাপতি এবং দেশের আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন সংবিধান বিলের আকারে গণপরিষদের অধিবেশনে উপস্থাপন করেন। ১৩ অক্টোবর গণপরিষদ নিজ কার্যপ্রণালির বিধিমালা গ্রহণ করে। ১৮ অক্টোবর থেকে গণপরিষদে সংবিধান বিল সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা শুরু হয় এবং ৩০ অক্টোবর তা সমাপ্ত হয়। ২০ অক্টোবর বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির সভাপতি মণিসিংহ ড. কামাল হোসেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সংবিধানের বিষয়ে তার পার্টির সুপারিশ উপস্থাপন করেন। ৩১ অক্টোবর থেকে গণপরিষদে খসড়া সংবিধানের ধারাওয়ারি আলোচনা শুরু হয়। ৩ নভেম্বর পর্যন্ত সে আলোচনা চলে। আলোচনাকালে আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্যগণ কর্তৃক আনীত কতিপয় সংশোধনী গ্রহণ করা হয়। সংবিধানের ৭৩নং অনুচ্ছেদ সম্পর্কে সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত কর্তৃক একটি সংশোধনী প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।[৫]

১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বরে গণপরিষদে সংবিধান বিল পাস হয়। ১৪ ডিসেম্বর (১৯৭২) স্পিকার, প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ ও গণপরিষদ সদস্যগণ সংবিধানের বাংলা ও ইংরেজি কপিতে স্বাক্ষর দান করেন। তবে একমাত্র বিরোধী দলীয় সদস্য সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত সংবিধান বইতে স্বাক্ষর দানে বিরত থাকেন। ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস থেকে সংবিধানটি কার্যকর করা হয়। এরপর গণপরিষদ ভেঙে দেয়া হয়।

গণপরিষদের প্রথম স্পিকার শাহ আবদুল হামিদ মৃত্যুবরণ করেন। (১২ অক্টোবর ১৯৭২) ইতোমধ্যে মোহাম্মদ উল্লাহকে স্পিকার ও বায়তুল্লাহকে ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত করা হয়েছিল। গণপরিষদ ভেঙে দেয়ার আগেই প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান গণপরিষদে ঘোষণা করেন যে, বিধিবদ্ধ সংবিধানের আওতায় দেশে ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

সংবিধান প্রণয়নকালীন বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতা ও দলের প্রতিক্রিয়া ও মতামতে সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে গণপরিষদ গঠনের ঘোষণা দেওয়ার পর সরকারকে রাজনৈতিক বিতর্কের সম্মুখীন হতে হয়। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো ১৯৭০ সালের নির্বাচনে নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের নিয়ে গণপরিষদ গঠনের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে। তাদের যুক্তি ছিল যে ১৯৭০ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রণীত 'আইন শাসন কাঠামো আদেশ বলে। উক্ত নির্বাচনে আওয়ামীলীগ পাকিস্তানের শাসন কাঠামোর মধ্যে ৬ দফার ভিত্তিতে একটি সংবিধান প্রণয়ন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিল। স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটার সাথে সাথে ১৯৭০ সালের নির্বাচন ও ঐ নির্বাচনে নির্বাচিত সদস্যগণ গ্রহণযোগ্যতা হারান। সুতরাং তারা দাবি করেন যে বাংলাদেশের জন্য একটি সংবিধান রচনা করতে হলে একটি নতুন সাংবিধানিক পরিষদ গঠন করতে হবে। এই দাবি নিয়ে ন্যাপ (ভাসানী) দলের নেতা মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী একটি সরকারবিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। ১৯৭২ সালের ৩ সেপ্টেম্বর এক জনসভায় তিনি সরকারের পদত্যাগ ও একটি জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠার দাবি উত্থাপন করেন। কিন্তু ভাসানীর আহ্বানে তেমন জনসমর্থন পাওয়া যায়নি।

স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশে গণপরিষদের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ সংবিধান কার্যকরী হয় ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর। কিন্তু এর পূর্বে স্বাধীনতা ঘোষণাকাল (১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ) থেকে স্বাধীনতা অর্জন (১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর) ও ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত আমরা অন্তর্বর্তীকালীন দুটি সংবিধান পাই :

১. স্বাধীনতা ঘোষণা পত্র (১০ এপ্রিল ১৯৭১) এবং ২. অস্থায়ী সংবিধান।

১.২.২. প্রথম অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান

স্বাধীনতা ঘোষণাপত্র : ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ চট্টগ্রাম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়। এই ঘোষণাকে অনুমোদন দানের জন্য তথা বাংলাদেশের জনগণের স্বাধীনতার দাবিতে ১০ এপ্রিল তারিখে 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' জারি করা হয়। ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে যারা পূর্ব পাকিস্তান থেকে জাতীয় আইন পরিষদ সদস্য (M.N.A) নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং যারা প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য (M.P.A.) নির্বাচিত হয়েছিলেন তাদের অধিকাংশই স্বাধীনতার ঘোষণার পর ভারতে চলে যান এবং তারা ১০ এপ্রিল কুষ্টিয়া জেলার মুজিবনগরে গণপরিষদ গঠনের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার গঠন করেন এবং এই অস্থায়ী সরকারের মাধ্যমে স্বাধীনতা ঘোষণাকে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন করা হয়। ঘোষণা অনুযায়ী এটা ছিল স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের বিপ্লবী সরকার। বিপ্লবী সরকারের এ ঘোষণা ২৬ মার্চ থেকে কার্যকরী করা হয়। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল স্বাধীন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার মুজিবনগরে আনুষ্ঠানিক ভাবে শপথ গ্রহণ করে। যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র সাময়িকভাবে অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধানের কাজ করেছে। এটি যদিও একটা ঘোষণা ছিল তথাপিও এটাকে সংবিধান বলা যেতে পারে। কারণ এতে রাষ্ট্রের প্রকৃতি, সরকার পদ্ধতি, সরকারের বিভাগ, সরকারের রূপরেখা পাওয়া যায়।

ঘোষণাপত্রে বাংলাদেশকে সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করা হয়। রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। শেখ মুজিবুর রহমানকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ও সৈয়দ নজরুল ইসলামকে উপ-রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করা হয়। ঘোষণা পত্রে বলা হয়।

১. রাষ্ট্রপতি প্রজাতন্ত্রের সকল সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হবেন।

২. রাষ্ট্রপতি যেকোনো ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রী নিয়োগ করতে পারবেন।

৩. রাষ্ট্রপতি কর ধার্য করবেন এবং অর্থ ব্যয় করবেন।

৪. রাষ্ট্রপতি প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী বিভাগের প্রধান হবেন।

৫. রাষ্ট্রপতি আইন প্রণয়নগত ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন।

৬. রাষ্ট্রপতি গণপরিষদের সভা আহবান ও স্থগিত করবেন।

যদিও দেখা যায় ঘোষণাপত্রে একজন রাষ্ট্রপতিকে একচেটিয়া ভাবে সকল আইন ও সংসদীয় ক্ষমতার অধিকারী করে একনায়কের পথ করে দেয়া হয়েছিল। তবে যুদ্ধকালীন অবস্থার প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রপতির জন্য এরূপ ক্ষমতার প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া এরূপ অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্টের পক্ষে ক্ষমতার অপব্যবহার করার কোনো উপায় ছিল না।

১.২.৩. দ্বিতীয় অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান

অস্থায়ী সংবিধান আদেশ : ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ সম্পূর্ণভাবে স্বাধীনতা লাভ করে। ২২ শে ডিসেম্বর মুজিব নগরস্থ প্রবাসী সরকার দেশে এসে দায়িত্ব নিলেন। তখন বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র অনুসারেই দেশ পরিচালিত হতে থাকে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। ১১ জানুয়ারি তিনি বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে বাংলাদেশের অস্থায়ী শাসনতন্ত্র আদেশ (Provisional constitutional order) জারি করেন। এ শাসনতান্ত্রিক আদেশ জারির পটভূমিতে বলা যায় যে, ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগরে যে স্বাধীনতা আদেশ জারি করা হয়েছিল তার অবসান ঘটেছে। তা ছাড়াও এদেশের গণমানুষ সংসদীয় গণতন্ত্র ব্যবস্থা প্রবর্তনের ইচ্ছা পোষণ করেন। ফলে জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি স্বাধীনতা ঘোষণার প্রেক্ষিতে এ অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি করেছেন। এটি ছিল বাংলাদেশের দ্বিতীয় অন্তর্বর্তীকালীন সংবিধান। ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারি থেকে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭২ পর্যন্ত এই অস্থায়ী সংবিধান আদেশ দেশে সংবিধানের কাজ করেছে। এতে বাংলাদেশের জন্য একটি ব্রিটিশ পদ্ধতির সংসদীয় সরকারের বিধান রাখা হয়। এতে বলা হয়—

১. বাংলাদেশে একটি মন্ত্রিসভা থাকবে এবং প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভার প্রধান থাকবেন (অনু:৫)।

২. রাষ্ট্রপতি তার সকল দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর সাথে পরামর্শক্রমে পালন করবেন (অনু : ৬)।

৩. ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর এবং ১৯৭১ সালের মধ্যবর্তী বিভিন্ন তারিখে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলোতে জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের আসনগুলোতে বিজয়ী বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি গণপরিষদ গঠিত হবে (অনু : ৪)।

আদেশের অধীনে ১২ জানুয়ারি শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্ট হিসেবে পদত্যাগ করেন এবং সংবিধান অনুযায়ী বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী প্রেসিডেন্ট হলেন এবং তিনি শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করলেন।

১.২.৪. অস্থায়ী সংবিধান আদেশের ধারাসমূহ

বঙ্গবন্ধু সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য ১১ জানুয়ারি, ১৯৭২ সালে যে অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারি করেন তার ধারাসমূহ ছিল নিম্নরূপ:

১. এ আদেশ বাংলাদেশের অস্থায়ী সংবিধান আদেশ ১৯৭২ নামে অভিহিত হবে।

২. এটি সমগ্র বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্য হবে।

৩. এটি অবিলম্বে বলবৎ হবে।

৪. বাংলাদেশে একটি মন্ত্রিপরিষদ থাকবে এবং প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিপরিষদের নেতৃত্বদান করবেন।

৫. প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি তার সব দায়িত্ব পালন করবেন।

৬. গণপরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের আস্থাভাজন একজন পরিষদ সদস্যকে প্রধানমন্ত্রী হিসেব নিয়োগ দান করবেন।

৭. প্রধানমন্ত্রীর পরমার্শ অনুযায়ী অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীর রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন।

৮. বাংলাদেশের গণপরিষদ গঠিত হবে ডিসেম্বর ১৯৭০ থেকে মার্চ ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সময়ে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের আসনসমূহে বিজয়ী এবং যারা দালাল আইনে বা অন্য কোনো

অপরাধমূলক কারণে অযোগ্য বিবেচিত হয়নি এমন সব সদস্যদের সমন্বয়ে।

৯. যতদিন পর্যন্ত স্বাধীন বাংলাদেশে গণপরিষদ কর্তৃক প্রণীত সংবিধান প্রবর্তন না হবে ততদিন পর্যন্ত এ আদেশ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি তার পদে বহাল থাকবেন।

১০. বাংলাদেশে একটি হাইকোর্ট থাকবে। প্রধান বিচারপতিও সময়ে সময়ে নিযুক্ত হতে পারেন এমন কয়েকজন বিচারপতি নিয়ে হাইকোর্ট গঠিত হবে।

১১. বাংলাদেশের হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন এবং প্রধানমন্ত্রী অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রীদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করবেন রাষ্ট্রপতি। শপথ বাক্যের কর্ম মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত হবে।

১.২.৫. গণ আদেশ জারি

বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের জন্য একটি স্থায়ী সংবিধান রচনার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ২৩ মার্চ ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ (রাষ্ট্রপতি ২২ নম্বর আদেশ) এবং বাংলাদেশ গণপরিষদ সদস্য (সদস্য পদ বাতিল আদেশ) নামে দুটি আদেশ জারি করেন। আদেশ দুটিতে কাদের নিয়ে গণপরিষদ গঠিত হবে এবং কারা গণপরিষদের সদস্য হতে পারবেন না সে বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশনা দেয়া হয়।

গণপরিষদের যাত্রা শুরু : সরকারের গণপরিষদ আদেশ ও গণপরিষদ সদস্য আদেশ জারির মাধ্যমে গণপরিষদ যাত্রা শুরু করে। এ অনুসারে ৭ ডিসেম্বর, ১৯৭০ সাল থেকে ১ মার্চ, ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন তারিখে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে National East (NE) ও Provincial East (PE) আসনে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে যারা কোনো আইন দ্বারা বা আইনের অধীনে অযোগ্য ঘোষিত হয়নি, তাদের নিয়ে গণপরিষদ গঠিত হবে। এ আইনে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে মোট ৪৬৯টি আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এর মধ্যে National East (NE) আসনের সংখ্যা ছিল ১৬৯ ও Provincial East (PE) আসনের সংখ্যা ছিল ৩০০। ১৬৯টিএনই আসনের মধ্যে ৭টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ছিল।

৩০০টি পিই আসনের অতিরিক্ত ১০টি আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। কিন্তু ঐ ১০টি Provincial East (PE) আসনে উপর্যুক্ত সময়ের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। সংশ্লিষ্ট আইনের অধীনে গণপরিষদের সদস্য হওয়ার অযোগ্যতা অর্জন সদস্যপদ রহিত হওয়া নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শপথ গ্রহণের ব্যর্থতা, মৃত্যুবরণ, ভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য পোষণ সরকারে লাভজনক পদে থাকা ইত্যাদি নানা কারণে ৬২টি আসন শূন্য হয়ে যায়। জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের অবশিষ্ট ৪০৭ জন সদস্য নিয়ে গণপরিষদের যাত্রা শুরু হয়।

১০ এপ্রিল, ১৯৭২ সালে গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। গণপরিষদের প্রবীণতম সদস্য মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ স্পিকার ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত গণপরিষদ পরিচালনার জন্য সভাপতি মনোনীত হন। গণপরিষদের সব সদস্যের ঐকমত্যে শাহ আবদুল হামিদ (এনই-৫) স্পিকার এবং জনাব মুহম্মদ উল্লাহ (পিই-২৪৭) ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন।

খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন : ১১ এপ্রিল, ১৯৭২ সালে গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনের দ্বিতীয় বৈঠকে সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের জন্য ৩৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। সৈয়দ নজরুল ইসলাম, জনাব তাজউদ্দীন আহমদ, খন্দকার মোশতাক আহমদ, জনাব এ এইচ এম কামরুজ্জামান, জনাব এম আবদুর রহীম, জনাব আবদুর রউফ, জনাব মো. লুৎফুর রহমান, জনাব আবদুল মোমিন তালুকদার, অধ্যাপক আবু সাইয়িদ, জনাব মোহাম্মদ বায়তুল্লাহ, জনাব আমীরুল ইসলাম, জনাব বাদল রশীদ, বার এট ল, খন্দকার আবদুল হাফিজ, জনাব মোহাম্মদ নুরুল ইসলাম মনজুর, জনাব শওকত আলী খান, জনাব মোঃ হুমায়ুন খালিদ, জনাব আসাদুজ্জামান খান, জনাব একে মুশাররফ হোসেন আখন্দ, জনাব আবদুল মমিন, জনাব শামসুদ্দিন মোল্লা, শেখ আবদুর রহমান, ফকির সাহাবউদ্দিন আহমদ, জনাব আবদুল মুন্তাকীম চৌধুরী, অধ্যাপক মো. খোরশেদ আলম, জনাব সিরাজুল হক, দেওয়ান আবুল আববাছ হাফিজ, হাবিবুর রহমান, জনাব মুহম্মদ আবদুর রশিদ, শ্রীযুক্ত সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত, নুরুল ইসলাম চৌধরী, জনাব মুহম্মদ খালেদ, মিসেস রাজিয়া বানু, ডা. ক্ষিতিশ চন্দ্র মণ্ডল এবং ড. কামাল হোসেন কমিটির সদস্য মনোনীত হন। ড. কামাল হোসেনকে কমিটির সভাপতির দায়িত্ব প্রদান করা হয়। নতুন

স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার নির্বাচন : গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনের পর ১ মে, ১৯৭২ সালে স্পিকার শাহ আবদুল হামিদ মৃত্যুবরণ করেন। গণ পরিষদ আদেশ ১৯৭২ অনুসারে ডেপুটি স্পিকার জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ অস্থায়ী স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব লাভ করেন। দ্বিতীয় অধিবেশনের সূচনাতেই স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। অস্থায়ী স্পিকার মোহাম্মদ উল্লাহ স্পিকার পদে এবং জনাব মোহাম্মদ বায়তুল্লাহ (এনই-৩২) ডেপুটি স্পিকার পদে সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত হন।

খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির রিপোর্ট : গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশনে খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সভাপতি এ কমিটির রিপোর্ট পেশ করেন। রিপোর্টের সঙ্গে কমিটি কর্তৃক প্রণীত সংবিধান বিল সংযোজিত ছিল। খসড়া সংবিধান কমিটির সদস্য জনাব আসাদুজ্জামান খান, জনাব একে মোশাররফ হোসেন আখন্দ, জনাব আবদুল মুকীম চৌধুরী, জনাব হাফিজ হাবিবুর রহমান ও শ্রীযুক্ত সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত অন্যান্য সদস্যের সঙ্গে কমিটির রিপোর্টে স্বাক্ষর করা সত্ত্বেও খসড়া সংবিধানের কয়েকটি বিধান সম্পর্কে ভিন্নমত পোষণ করেন। তাদের মতানৈক্যমূলক মন্তব্য রিপোর্টের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির রিপোর্ট ও তার সঙ্গে সংবিধানের খসড়াটি সংবিধান বিল হিসেবে গণপরিষদে উত্থাপিত হয়।

গণপরিষদে সংবিধান বিল উত্থাপন : ৪ নভেম্বর, ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সাংবিধানিক পথচলার গৌরবময় ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিন। এ দিন গণপরিষদে প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে একট সংবিধান প্রদানের উদ্দেশ্যে পরিষদে স্থিতিকৃত আকারে 'সংবিধান' বিলটি গ্রহণ করা হোক'। প্রস্তাবটির ওপর শ্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত, শ্রী মানবেন্দ্র নারায়ণ লারমা ও পরিষদ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বক্তব্য রাখেন।

সংবিধান বিল পাস : গণপরিষদ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তব্যের পর স্পিকার প্রস্তাবটি ভোটে দেন এবং ভোট গ্রহণের পরে ঘোষণা করেন পরিষদে স্থিতিকৃত আকারে সংবিধান বিল পাস হলো। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সংবিধান গণপরিষদে গৃহীত হওয়া উপলক্ষে পরিষদ নেতার প্রস্তাবক্রমে গণপরিষদের প্রবীণতম সদস্য মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশের পরিচালনায় মুনাজাত করা হয়।

১.২.৬. বাংলাদেশের চূড়ান্ত সংবিধান প্রণয়ন

সংবিধান একটি রাষ্ট্রের শাসকদের পথ প্রদর্শক। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলে একটি সংবিধান রচনা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। তাই বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নে উদ্যোগী হয়। কিন্তু সংবিধান প্রণয়ন একটি জটিল প্রক্রিয়া, বিধায় তা প্রথমেই স্থায়ীভাবে প্রণয়ন করা সম্ভব হয়নি। বরং বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে সংবিধান গৃহীত হয়। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

১. গণপরিষদ আদেশ : একটি সংবিধান প্রণয়ন করে জাতির আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য রাষ্ট্রপতি ১৯৭২ সালের ২২ মার্চ বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ (The Constituent Assembly order of Bangladesh) জারি করেন। এই আদেশ ছিল বাংলাদেশ সংবিধান প্রণয়নের প্রথম পদক্ষেপ। এই আদেশে বলা হয়–

১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর ও ১৯৭১ সালের ১ মার্চের মধ্যবর্তী বিভিন্ন তারিখে অনুষ্ঠিত নির্বাচনগুলোতে জাতীয়, প্রাদেশিক পরিষদের আসনগুলোতে বিজয়ী বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে গণপরিষদ গঠিত হবে।

খ. পরিষদ প্রজাতন্ত্রের জন্য একটি সংবিধান প্রণয়ন করবে।

এখানে সমালোচনার বিষয় হলো যে, গণপরিষদকে শুধু একটি সংবিধান রচনার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। অথচ গণপরিষদ জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল। এদের হাতেই আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকার কথা, কিন্তু তা দেয়া হলো না। স্বাধীনতা সংগ্রাম না হলে এই গণপরিষদের সদস্যগণই পাকিস্তানের জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে আইন প্রণয়নের কাজ করতেন।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য যে, ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনে পাকিস্তান ও ভারত ডোমিনিয়নের গণপরিষদের হাতে দু'টি ক্ষমতা অর্পণ করেছিল।

ক. গণপরিষদদ্বয় স্ব-স্ব দেশের জন্য নতুন শাসনতন্ত্র রচনা করবে। এবং

খ. নতুন শাসনতন্ত্র রচনার পূর্ব পর্যন্ত গণপরিষদ উভয় দেশের আইন সভারূপে কাজ করবে।

সুতরাং এখানে গণপরিষদের হাতে সংবিধান রচনার সাথে সাথে আইন প্রণয়নের ক্ষমতাও দেয়া হয়েছে। আর এই ক্ষমতা বলে পাকিস্তান গণপরিষদ সরকারের কেন্দ্রীয় আইনসভা হিসেবে কার্যচালনা ও ক্ষমতা ভোগ করছিল। উহা মন্ত্রিসভার উপর নিয়ন্ত্রণচর্চার অধিকার ছিল। পাকিস্তান মন্ত্রীসভা গণপরিষদের নিকট যৌথভাবে দায়ী ছিল। কেন্দ্রীয় আইনসভার অনুমোদন ব্যতীত মন্ত্রিসভা রাজস্ব আদায় করতে বা অর্থ ব্যয় করতে পারতো না বা এর ইচ্ছার বিরুদ্ধে মন্ত্রিসভা ক্ষমতায় থাকতে পারতো না। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তান সংবিধান প্রণয়নে পাকিস্তানের দ্বিতীয় গণপরিষদও একইভাবে দ্বিবিধ ক্ষমতা ভোগ করেছিল। অথচ আমাদের দেশের গণপরিষদের হাতে এরূপ আইনসভার দায়িত্ব দেয়া হয়নি। আইন প্রণয়নের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল প্রেসিডেন্টের হাতে। প্রেসিডেন্ট আদেশ জারির মাধ্যমে যখন যেরূপ মনে করতেন আইন প্রণয়ন করতে পারতেন। ফলে গণপরিষদের প্রেসিডেন্ট প্রধানমন্ত্রীর আজ্ঞাবহ হতে হয়েছিল।

২. গণপরিষদের উদ্বোধনী অধিবেশন : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন আহ্বান করেন। এ অধিবেশনে গণপরিষদ সদস্যগণ কর্তৃক স্পিকার নির্বাচিত হন শাহ আবদুল হামিদ এবং ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হন জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ। উল্লেখ্য ৪০৬ জন সদস্য এ অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন।

৩. সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন : ১৯৭২ সালের ১১ এপ্রিল ড. কামাল হোসেনকে সভাপতি করে ৩৪ সদস্যের একটি খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি গঠন করা হয়। ৩৪ জনের মধ্যে ৩৩ জন ছিল আওয়ামী লীগ দলীয় গণপরিষদ সদস্য এবং অবশিষ্ট একজন শ্রী সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত ছিলেন ন্যাপ (মোজাফফর) দলীয় সদস্য। গণপরিষদের ৩ জন মহিলা সদস্যের মধ্য থেকে একজনকে এ কমিটির সদস্য করা হয়। খসড়া কমিটিকে ১৯৭২ সালের ১০ জুনের মধ্যে একটি বিলের আকারে সংবিধানের খসড়া গণপরিষদে পেশ করতে বলা হয়।

৪. খসড়া কমিটির প্রথম বৈঠক : খসড়া কমিটি প্রথম বৈঠকে বসে ১৯৭২ সালের ১৭ এপ্রিল। উক্ত কমিটি সংবিধান সম্পর্কে দেশের বিভিন্ন সংগঠন ও আগ্রহী ব্যক্তিদের নিকট থেকে জনমত আহ্বান করে। খসড়া কমিটি সর্বমোট ৪৭টি বৈঠকে ৩০০ ঘণ্টায় খসড়া চূড়ান্ত করে। ১৯৭২ সালের ১০ জুন কমিটি প্রাথমিক খসড়া প্রণয়ন করে। অতঃপর কমিটির

সভাপতি ড. কামাল হোসেন ভারত ও যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশে গিয়ে সংবিধান প্রণেতাদের সাথে আলাপ আলোচনা করে এ বিষয়ে ব্যাপক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। প্রস্তাবিত সংবিধানের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে ১৯৭২ সালের ১১ অক্টোবর কমিটির শেষ বৈঠকে খসড়া সংবিধানের চূড়ান্ত রূপ গৃহীত হয়।

৫. গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন : ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর গণপরিষদের দ্বিতীয় অধিবেশন বসে। অধিবেশনে ড. কামাল হোসেন খসড়া সংবিধান বিল আকারে গণপরিষদে উত্থাপন করেন। এ অধিবেশন ১৯ অক্টোবর পর্যন্ত চলে। এতে সংবিধানের ওপর প্রথম পাঠ শুরু হয় এবং ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত চলে। এতে সর্বমোট ১০টি বৈঠকে ৩২ ঘণ্টা সময় ব্যয় হয়। অতঃপর ৩১ অক্টোবর দ্বিতীয় পাঠ শুরু হয় এবং ৩ নভেম্বর পর্যন্ত তা চলে। ৪ নভেম্বর সংববিধানের ওপর তৃতীয় ও সর্বশেষ পাঠ শুরু হয় এবং মাত্র ২ ঘণ্টার মধ্যে তা সম্পন্ন হলে বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ সংবিধান গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়।

৬. প্রধানমন্ত্রী ও আইনমন্ত্রীর মন্তব্য : এ সংবিধান সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সকল নাগরিক এবং গণপরিষদের সদস্যদের বলেন যে, এ সংবিধান শহীদের রক্তে লিখিত। তিনি সকলকে সংবিধানের যে কোনো ধারার উপর সংশোধনী প্রস্তাব দেওয়ার আহ্বান করেন। আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন বলেন, 'এই সংবিধান গণতান্ত্রিক উপায়ে শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার এমন এক প্রস্তাব করে যাতে আইনের শাসন, মৌলিক মানবিক অধিকার এবং স্বাধীনতা, সাম্য, ন্যায়বিচার অর্জিত হবে।

৭. আপত্তি ও সুপারিশ উত্থাপন : খসড়া সংবিধানের কোনো কোনো বিষয়ে বিভিন্ন আপত্তি ও সুপারিশ উত্থাপিত হয়। কমিটির ৬ জন সদস্য খসড়া সংবিধানের বিধানাবলির প্রতি আপত্তি করেন এবং সে আপত্তি তারা কমিটি রিপোর্টে পৃথকভাবে লিপিবদ্ধ করেন। মতানৈক্যের ক্ষেত্রে কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১১ অক্টোবর আওয়ামী লীগ সাংগঠনিক কমিটির বৈঠকে খসড়া সংবিধানের কয়েকটি সংশোধনী প্রস্তাব করা হয়।

৮. সংবিধানে স্বাক্ষর প্রদান : ১৯৭২ সালের ১৪ ও ১৫ ডিসেম্বর গণপরিষদের একটি আনুষ্ঠানিক অধিবেশন বসে। এ অধিবেশনে গণপরিষদ সদস্যগণ হস্তলিখিত সংবিধানের অনুলিপিতে স্বাক্ষর প্রদান করেন এবং সংবিধানের পক্ষে তাদের পূর্ণ সম্মতি প্রদান করেন।

৯. সংবিধান বিধিবদ্ধকরণ : ১৯৭২ সালের ১২ অক্টোবর গণপরিষদ অধিবেশনে মিলিত হয়ে যে সংবিধান প্রণয়ন করে তা ৪ নভেম্বর গণপরিষদের জনপ্রতিনিধিগণ স্বাধীন বাংলাদেশের স্থায়ী সংবিধানরূপে গণ্য করেন। এভাবে ১৯৭২ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে বিধিবদ্ধ বাংলাদেশ সংবিধান বলবৎ হয়।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, সংবিধান প্রণয়নের ব্যাপারে সাধারণত কোনো কোনো দেশ যেসব অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে থাকে বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সেসব অসুবিধা দেখা দেয়নি। কারণ এখানে ছিল গণপরিষদ এবং এর সদস্যবৃন্দ। গণপরিষদের সংবিধানে খসড়া অনুমোদিত হলে বিভিন্ন দল ও সংগঠন উক্ত সংবিধান সম্পর্কে তেমন জোরালো কোনো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেনি। ফলে জনসাধারণ সামগ্রিকভাবে উক্ত সংবিধান গ্রহণ করে নেয়। সুতরাং বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নে গণপরিষদের ভূমিকা অপরিসীম।[৬]

১.২.৭. বাংলাদেশের ১৯৭২ সালের সংবিধানের বৈশিষ্ট্যসমুহ

যে কোনো সংবিধান নির্দিষ্ট কতগুলো বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। বাংলাদেশের সংবিধানও এর ব্যতিক্রম নয়। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে ১৯৭২ সালে প্রণীত মূল সংবিধানের বৈশিষ্ট্যসমুহ নিম্নে আলোচনা করা হলো।

১. লিখিতরূপ : ১৯৭২ সালে প্রণীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মূল সংবিধান একটি লিখিত সংবিধান বা দলিল বিশেষ। এই সংবিধানকে একটি বিশেষ দিনে (৪ নভেম্বর, ১৯৭২) লিখিত অবস্থায় গণপরিষদ কর্তৃক পাস করা হয়। এই সংবিধানে ১টি প্রস্তাবনা, ৪টি তফসিল ও ১৫৩টি অনুচ্ছেদ রয়েছে। ১৫৩ টি অনুচ্ছেদ আবার ১১টি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

বাংলাদেশের সংবিধানের ১১টি ভাগ

ভাগ	বিষয়	অনুচ্ছেদ
১ম	প্রজাতন্ত্র	১–৭
২য়	রাষ্ট পরিচালনার মূলনীতি	৮–২৫
৩য়	মৌলিক অধিকার	২৬–৪৭
৪র্থ	নির্বাহী বিভাগ	৪৮–৬৪
৫ম	আইনসভা	৬৫–৯৩
৬ষ্ঠ	বিচার বিভাগ	৯৪–৯৭
৭ম	নির্বাচন	৯৮–১২৬
৮ম	মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক	১২৭–১৩২
৯ম	বাংলাদেশ কর্মকমিশন	১৩৩–১৪১
৯ম (ক)	জরুরি বিধানাবলি	১৪১ক–১৪১গ
১০ম	সংবিধান সংশোধন	১৪২
১১ তম	বিবিধ	১৪৩–১৫৩

২. দুস্পরিবর্তনীয় সংবিধান : ১৯৭২ সালে প্রণীত বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধন পদ্ধতির দিক দিয়ে দুস্পরিবর্তনীয়। কেননা সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধতির ন্যায় এটিকে সংশোধন করা যায় না। তবে এর সংশোধন পদ্ধতি মার্কিন সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতির ন্যায় খুব জটিল নয়। সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সংসদের মোট সদস্যদের অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যদের ভোটে সংবিধানের সংশোধনী বিল গ্রহণ করা যেত। সংসদ কর্তৃক এরূপ গৃহীত বিল সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপনের ৭ দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি এতে সম্মতি দিবেন। কিন্তু নির্ধারিত

সময়ে তিনি সম্মতি দানে অসমর্থ হলে ৭ দিন মেয়াদ শেষে আইনরূপে বলবৎ হত। আবার সংবিধানের কিছু মৌলিক বিষয় সংশোধন করতে হলে গণভোটের প্রয়োজন হয়।

৩. প্রস্তাবনা : বালাদেশ সাংবিধান একটি প্রস্তাবনা দিয়ে শুরু হয়েছে। এটিকে সংবিধানিক দিক নির্দেশনা (guiding star) বলা হয়। কেননা বলা হয় যে, এই প্রস্তাবনাকে সামনে রেখে এটিকে দিক নির্দেশনা হিসেবে ধরে দেশের সকল কার্য পরিচালিত হবে; সরকার পরিচালিত হবে।

৪. প্রজাতন্ত্র : বাংলাদেশ সংবিধানের ১নং অনুচ্ছেদের ১নং ধারায় বর্ণিত প্রজাতন্ত্রের প্রস্তাবনা অনুসারে বাংলাদেশ একটি একক স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ নামে পরিচিত। প্রজাতন্ত্রের প্রস্তাবনায় আরো বলা হয়েছে, স্বাধীনতার ঘোষণার পূর্বে যেমন এলাকা নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান গঠিত ছিল স্বাধীনতার পর সেই সব এলাকা নিয়েই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ গঠিত হবে।

৫. গণতন্ত্র : ১৯৭২ সালের সংবিধানে গণতন্ত্রের ব্যাখ্যায় উল্লেখ করা হয়, প্রজাতন্ত্র হবে একটি গণতন্ত্র, যেখানে মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতার নিশ্চয়তা থাকবে। মানবসত্তার মর্যাদা ও মূল্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ নিশ্চিত হবে এবং প্রশাসনের সকল পর্যায়ে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হবে। (অনুচ্ছেদ-১১)

৬. সংবিধানের প্রাধান্য : বাংলাদেশ সংবিধানের সংবিধান বা শাসনতন্ত্রের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেননা সংবিধানকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইনের মর্যাদা প্রদান করা হয়। বলা হয় প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। সংবিধান জনগণের পক্ষে কর্তৃত্ব প্রয়োগ করবে। আবার সংবিধানের ৭(২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন। অন্য কোনো আইন যদি এ সংবিধানের সাথে অসামঞ্জস্য হয় তবে যতখানি অসামঞ্জস্য হবে ততখানি বাতিল বলে গণ্য হবে। সংবিধানের মর্যাদা ও প্রাধান্য রক্ষার দায়িত্ব সুপ্রিম কোর্টের উপর ন্যস্ত করা হয়। কোনো আইন সংবিধানের পরিপন্থী হলে তাকে সুপ্রিমকোর্ট বাতিল বলে ঘোষণা করতে পারে। তাছাড়া যুদ্ধ ঘোষণা বা যুদ্ধে অংশ গ্রহণের জন্য সংসদ সদস্যদের সম্মতি প্রয়োজন।

৭. রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি : ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সংবিধানের ২য় বিভাগের ৮নং অনুচ্ছেদে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি নামে কতিপয় নীতি সংযোজন করা হয়। রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি ছিল চারটি। এগুলো হলো জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা। অন্যান্য নীতিগুলোকে এই চারটি আদর্শ থেকে উৎসারিত বলে ঘোষণা করা হয়। এই নীতিগুলো রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি হিসেবে গৃহীত হবে এবং আইন প্রণয়ন করে এগুলো প্রয়োগ করা হবে। কিন্তু আদালতের মাধ্যমে তা কার্যকর হবে না। পরবর্তীকালে রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীর মাধ্যমে এই মূলনীতির পরিবর্তন সাধন করে বলেন, সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণআস্থা ও বিশ্বাস, জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার এই অর্থে সমাজতন্ত্র।

৮. নাগরিকত্ব : গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ৬নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাংলাদেশের প্রত্যেক নাগরিক বাঙালি বলে পরিচিত হবে এবং তাদের এ নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত হবে। অর্থাৎ জাতীয়তাবাদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে প্রাধান্য দেওয়া হয়।

৯. এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র : বাংলাদেশের সংবিধানের ১নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশ একটি এককেন্দ্রিক গণপ্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্র হবে। এককেন্দ্রিক এ কারণে যে, সংবিধান অনুযায়ী সরকারের সকল ক্ষমতা একটিমাত্র সরকারের কাছে কেন্দ্রীভূত করা হয়েছে। ক্ষমতার কোনো সাংবিধানিক বিভাজন করা হয়নি। উল্লেখ্য, এখানে স্থানীয় সরকারের ধারণা আসতে পারে যেগুলো জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়। কিন্তু এ সকল স্থানীয় সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্ট হিসেবে কাজ করে, সরকারের অধীনে কাজ করে, সংবিধানের মাধ্যমে এসকল স্থানীয় সরকারকে কোনো ক্ষমতা ভাগ করে দেয়া হয়নি।

১০. এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা : ভৌগোলিক, ভাষাগত, ধর্ম ও কৃষ্টিগত অখণ্ডতার কারণে বাংলাদেশে যেমন এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে, সেকারণেই এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার বিধান সংবিধানে গৃহীত হয়েছে। প্রায় সকল বিষয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ ক্ষুদ্র এবং অনুন্নত রাষ্ট্রের জন্য এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা প্রণীত করাই সমীচীন। বাংলাদেশের আইনসভার নামকরণ করা হয় জাতীয় সংসদ'। ৩০০ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং তাদের দ্বারা মনোনীত ১৫ জন মহিলা সদস্য অর্থাৎ ৩১৫

জন সদস্য সমন্বয়ে তখনকার জাতীয় সংসদ গঠিত হত। ১৯৭২ সালের সংবিধানে ১৫টি মহিলা আসন ১০ বছরের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়। ১৯৭২ সালের সংবিধানে বিধিবদ্ধ করা হয় যে, ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ দালাল আদেশের অধীনে কেউ যে কোনো অপরাধের জন্য যে কোনো মেয়াদের জন্য দণ্ডিত হন তবে তিনি সংসদ সদস্য হবার অযোগ্য হবেন (অনুচ্ছেদ ৬৬. যা ১৯৭৮ সালে বিলুপ্ত হয়)।

১১. মৌলিক অধিকার : নাগরিকদের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ উন্মুক্ত করার তাগিদে বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় ভাগে ২৬-৪৭-অনুচ্ছেদ পর্যন্ত মোট ১৮টি মৌলিক অধিকার সংবিধানে লিপিবদ্ধ করা হয়। সার্বভৌম সংবিধানের মাধ্যমে প্রাপ্ত এ সকল অধিকার হচ্ছে সাম্যের অধিকার, চলাফেরা, সভা সমিতি, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা, সম্পত্তির অধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রভৃতি অত্যাবশ্যক ও স্বাভাবিক মানবিক অধিকার। এসব মৌলিক অধিকারের পরিপন্থী কোনো আইন পাশ করা হবে না। যদি পাস করা হয় তবে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। এসব মৌলিক অধিকারের অভিভাবক ও সংরক্ষণকারী হলো সুপ্রিম কোর্ট। অর্থাৎ এসব মৌলিক অধিকার আদালতের মাধ্যমে বলবৎযোগ্য। তবে জরুরি অবস্থায় বা রাষ্ট্রের কোনো প্রয়োজনীয় পরিস্থিতিতে প্রয়োজনবোধে জাতীয় সংসদ আইনের দ্বারা এ সকল মৌলিক অধিকারের উপর সাময়িকভাবে যুক্তিসংগত বাধা নিষেধ আরোপ করতে পারে।

১২. নামসর্বস্ব রাষ্ট্রপ্রধান : ১৯৭২ সালের সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি হবেন একজন নামসর্বস্ব বা নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান। তিনি সংসদ সদস্যদের ভোটে ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত হবেন।

১৩. সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা : গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা সংসদীয় কিংবা রাষ্ট্রপতি শাসিত হতে পারে। ১৯৭২ সালের সংবিধান অনুযায়ী বাংলাদেশে জবাবদিহিতা মূলক সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। এই সরকার ব্যবস্থার প্রধান হবেন নিয়মতান্ত্রিক প্রধান এবং প্রধানমন্ত্রী হবেন প্রকৃত শাসক সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে সংখ্যা গরিষ্ঠ নেতাকে প্রধানমন্ত্রী পদে রাষ্ট্রপতি সাংবিধানিক উপায়ে নিয়োগ প্রদান করবেন। প্রধানন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রীসভা প্রজাতন্ত্রের সকল নির্বাহী ক্ষমতা চর্চা করবেন এবং মন্ত্রিসভা তার কাজের জন্য একক ও যৌথভাবে সংসদের নিকট দায়ী থাকবেন। সংসদের

সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের আস্থা হারালে মন্ত্রিসভা বাতিল হয়ে যাবে। এ ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপতি হবেন নামমাত্র বা সাংবিধানিক প্রধান। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ব্রিটেনের প্রচলিত সংসদীয় রীতিনীতিসমূহ বাংলাদেশ সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

১৪. বিচার বিভাগের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা : বাংলাদেশের বিচার বিভাগ একটি সুপ্রিমকোর্ট, অন্যান্য আদালত ও প্রশাসনিক ট্রাইবুন্যাল নিয়ে গঠিত হবে। বাংলাদেশ সংবিধান মোতাবেক বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট নামে অভিহিত হবে। আপীল বিভাগ এবং হাই কোর্ট বিভাগ নিয়ে গঠিত এই সুপ্রিম কোর্ট শাসন বিভাগ থেকে পৃথক থাকবে। সংবিধানের কোনো বিধানের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ কোনো আইনকে অবৈধ ঘোষণা করার অধিকার সুপ্রিম কোর্টের থাকবে। মৌলিক অধিকার রক্ষা করার প্রয়োজনীয় রীট জারি করার ক্ষমতাও বিচার বিভাগের রয়েছে। সংবিধানের ২২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের নির্বাহী অর্থাৎ শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করবে। অর্থাৎ ১৯৭২ সালের সংবিধান মোতাবেক বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অনেকটা নিশ্চিত হয়েছিল। এর স্বপক্ষে কয়েকটি সাংবিধানিক ধারার আলোকে বলা যায়–

প্রথমত : যুক্ত ও স্বাধীন একটি বিচার বিভাগ গঠনের লক্ষ্যে সংবিধানের বিধানাবলির সাপেক্ষে প্রধান বিচারপতি এবং অন্যান্য বিচারপতিগণ স্বাধীন অবস্থায় থেকে বিচার কার্য পরিচালনা করবেন। [(৪)] অনুচ্ছেদ-৯৪।

দ্বিতীয়ত : প্রধান বিচারপতিকে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগদান এবং প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শক্রমে অন্যান্য বিচারপতিগণকে নিয়োগের বিধান করা হয় (অনুচ্ছেদ-৯৫)। অধঃস্তন আদালতের জজ ও ম্যাজিস্ট্রেটদেরকে নিয়োগের ক্ষমতাও সুপ্রিম কোর্টের হাতে দেয়া হয়েছিল। (অনুচ্ছেদ-১১৫)।

তৃতীয়ত : কোনো বিচারকের বিরুদ্ধে অসামর্থতা ও অসদাচরণের অভিযোগে আনীত প্রস্তাব সংসদে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পাস হলেই কেবল তাকে অপসারণ করা যেত। সংসদে দুই তৃতীয়াংশ সদস্যদের সমর্থন পাওয়া খুব কঠিন ব্যাপার। আবার, অধঃস্তন আদালতের বিচারকদের চাকরির নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টের হাতে। সুতরাং বলা যায় যে, বিচারকদের চাকরির নিশ্চয়তা সুনিশ্চিত ছিল।

চতুর্থত : ১৪৭ (২) অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের বিচারকদের বেতন ও কর্মের শর্তাবলি এমন তারতম্য করা যাবে না যা তার পক্ষে অসুবিধাজনক হতে পারে। তাদের বেতন ও অন্যান্য ব্যয় সংযুক্ত তহবিল থেকে হবে।

পঞ্চমত : অধঃস্তন আদালতের জজ ও ম্যাজিস্ট্রেটদের নিয়ন্ত্রণ, কর্মস্থল নির্ধারণ পদোন্নতিদান ও ছুটি মঞ্জুরীসহ শৃঙ্খলা বিধান সুপ্রিমকোর্টের উপর ন্যাস্ত করা হয়। (অনুচ্ছেদ-১১৬)।

সুতরাং বিচার বিভাগ মোটামুটিভাবে আইন ও শাসন বিভাগের হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত ছিল (শুধু অধঃস্তন আদালতের বিচারকগণ ব্যতীত।)

১৫. প্রশাসনিক ট্রাইবুন্যাল : সাধারণ বিচার বিভাগ ছাড়াও বাংলাদেশ সংবিধানে প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের বিধান রয়েছে। সংবিধানের **১১৭**নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সরকারি কর্মচারীদের কর্মের শর্তাবলি, নিয়োগ, বদলি, বরখাস্ত, পদোন্নতি, দণ্ড ও কর্মের মেয়াদ, রাষ্ট্রের উদ্যোগ ও সম্পত্তি পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিষয়সমূহের উপর প্রশাসনিক ট্রাইবুন্যালের এখতিয়ার থাকবে। প্রশাসনিক ট্রাইবুন্যালের উপর সুপ্রিম কোর্টকে কোনো নিয়ন্ত্রণমূলক ক্ষমতা দেয়া হয়নি। আপীলের বিধানও করা হয়নি। সুতরাং **১১৭**টি অনুচ্ছেদে সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতার উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। ভারত বা যুক্তরাষ্ট্রে এ ধরনের প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালের বিধান নেই।

১৬. ন্যায়পাল : বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৭নং অনুচ্ছেদে ন্যায়পালের বিধান রয়েছে। সংবিধানের উক্ত অনুচ্ছেদে বলা হয় সংসদ আইনের দ্বারা ন্যায়পালের জন্য বিধান করতে পারবেন এবং তিনি যে কোনো মন্ত্রণালয়, সরকারি কর্মচারী বা সংবিধিবদ্ধ কর্তৃপক্ষের যে কোনো কার্য সম্পর্কে তদন্ত পরিচালনার ক্ষমতাসহ অন্যান্য ক্ষমতা ও দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। ন্যায়পাল তার দায়িত্ব পালন সম্পর্কে বাৎসরিক রিপোর্ট প্রণয়ন করবেন এবং অনুরূপ রিপোর্ট সংসদে উপস্থাপিত করবেন।

বাংলাদেশে ন্যায়পাল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবেন। কিন্তু তিনি শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণমুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করবেন। তিনি আইন সভার নিকট দায়ী এবং কেবল আইনসভার উপদেশ বা আবেদন ক্রমে তাকে

অপসারণ করা যাবে, তার প্রধান কর্তব্য শাসন বিভাগের বিরুদ্ধে অভিযোগ শ্রবণ করা। আইনসভার সদস্য বা যে কোনো ব্যক্তি বা কোনো প্রতিষ্ঠান অনুরূপ অভিযোগ উত্থাপন করতে পারবেন। ন্যায়পাল অভিযোগ সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য কোনো মন্ত্রণালয়, সরকারি কর্মচারি বা কর্তৃপক্ষের কার্য তদন্ত করবেন এবং সাক্ষ্য প্রমাণাদি গ্রহণ করবেন। সরকারি যে কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের কাজের নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য তথা তাদের জবাবদিহিতা অধিকতর নিশ্চিতকরণে ন্যায়পালের ভূমিকা গণতান্ত্রিক সফলতায় অসীম। কিন্ত বিধান থাকলেও আজ পর্যন্ত ন্যায়পাল পদটি কার্যকর করা হয়নি।

১৭. জনগণের সার্বভৌমত্ব : সংবিধান অনুসারে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষমতার মালিক হলো জনগণ (অনুচ্ছেদ-৭)। জনগণের পক্ষে সংবিধান অনুযায়ী নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এ ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়। অর্থাৎ জনগণ প্রত্যক্ষভাবে প্রতিনিধি প্রেরণের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রপরিচালনার ক্ষমতা রাখে।

১৮. সুপ্রিম জুডিসিয়াল কাউন্সিল : বাংলাদেশ সংবিধানে সুপ্রিম জুডিসিয়িাল কাউন্সিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী অনুযায়ী এটি শুধু কাউন্সিল নামে অভিহিত হবে। প্রধান বিচারপতি এবং সর্বাপেক্ষা প্রবীণতম দুজন বিচারপতি নিয়ে এ কাউন্সিল গঠিত হবে। এদের প্রধান কর্তব্য হবে বিচার কাজের জন্য অবশ্য পালনীয় আচরণ বিধি নির্ধারণ করা।

১৯. নির্বাচন কমিশন ও কর্মকমিশন গঠন : স্বাধীন বাংলাদেশে ১৯৭২ সালের সংবিধানে নির্বাচন পরিচালনার জন্য নির্বাচন কমিশন এবং সরকারি চাকরিতে লোক নিয়োগের জন্য কর্মকমিশনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

২০. সংসদ সদস্যদের নিয়ন্ত্রণ : পাকিস্তান আমলের তিক্ত অভিজ্ঞতার প্রেক্ষিতে স্বাধীন বাংলাদেশের **১৯৭২** সালের সংবিধানে একটি বিশেষ বিধান করা হয়। বাংলাদেশের সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষা ও সরকারের স্থিতিশীলতার স্বার্থে সকল সংসদ সদস্য পদ নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক। এ উদ্দেশ্যে বিধান করা হয় যে, কোনো সদস্য তার দল ত্যাগ করলে অথবা বহিস্কৃত হলে সংসদে তার পদ শূন্য বলে বিবেচিত হবে।

২১. মহিলা নাগরিকদের অবস্থান : বাংলাদেশের সংবিধানে জাতীয় জীবনের সর্বত্র মহিলা নাগরিকদের অংশগ্রহণের নিশ্চয়তা বিধানের ব্যবস্থা রয়েছে। সংবিধানের ২৮(১) ধারায় বলা হয়েছে কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী, পুরুষভেদে বা জন্মস্থানের কারণে কোনো নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না। ২৮(২) ধারায় বলা হয়েছে রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষ সমান অধিকার লাভ করবে। ৬৫(৩) ধারায় নারীর জন্য আসন সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এ ধারার অধীনে স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে।

২২. সার্বজনীন ভোটাধিকার : বাংলাদেশ সংবিধান অনুযায়ী ন্যূনতম আঠারো বছরের ঊর্ধ্বে যে কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশে ভোটাধিকার প্রয়োগ করার যোগ্য। এক ব্যক্তি এক ভোট এই নীতিই বাংলাদেশ সংবিধানের সার্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তি।

২৩. মালিকানার নীতি : বাংলাদেশের সংবিধানের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো এখানে তিন শ্রেণির মালিকানার নীতিকে স্বীকার করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে রাষ্ট্রীয় মালিকানা, সমবায় মালিকানা এবং ব্যক্তিগত মালিকানা।

২৪. সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থা : বাংলাদেশের ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানে সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। তবে তা শ্রেণিসংগ্রাম ও বিপ্লবের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়নি। এই সংবিধানে সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে সমাজতন্ত্র ঘোষণার কথা স্বীকার করে উৎপাদন ব্যবস্থা জনগণের নিয়ন্ত্রণে রাখার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জনগণের পক্ষে রাষ্ট্রের মালিকানা থাকবে এবং আইনের দ্বারা সমবায়ী ও ব্যক্তিগত মালিকানা নির্ধারণ করা হবে। জাতীয় সংসদ প্রয়োজনবোধে ব্যক্তিগত সম্পত্তি জাতীয়করণ করতে পারবে। ১৯৭২ সালের সংবিধানে সমাজতন্ত্রের যে উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হয়েছিল তা হচ্ছে মানুষের উপর মানুষের শোষণবিহীন ন্যায়ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে একটি সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করা। (অনুচ্ছেদ-১০)

২৫. ধর্মনিরপেক্ষতা : ১৯৭২ সালের সংবিধানে ঘোষণা করা হয় যে, বাংলাদেশ একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। প্রত্যেকের ধর্মীয় স্বাধীনতা থাকবে এবং সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতা নিষিদ্ধ করা হয়।

২৬. ইংরেজি পাঠের প্রাধান্য : বাংলাদেশ সংবিধান অনুসারে ইংরেজি ও বাংলা পাঠের মধ্যে কোনো বিরোধ বা পার্থক্য দেখা দিলে ইংরেজি পাঠ বলবৎ থাকবে।

বাংলাদেশের মূল সংবিধানের বৈশিষ্ট্যসমুহ আলোচনা করলে দেখা যায় যে, মাত্র দু একটি বিধান ব্যতীত (যেমন ৭০ অনুচ্ছেদ) সকল বিষয় নিয়ে একটি উন্নত সংবিধান আমাদের উপহার দেয়া হয়েছিল। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও সাংবিধানিক সরকার প্রতিষ্ঠার সকল উপাদান নিশ্চিত করা হয়েছিল। জরুরি অবস্থা বা নিবর্তনমূলক আটকের মতো অগণতান্ত্রিক বিধানকে সংবিধানে স্থান দেয়া হয়নি। কিন্তু উত্তম সংবিধানের এই সুফল বাংলাদেশের জনগণ বেশিদিন ভোগ করতে পারেনি। বিভিন্ন সংশোধনীর মাধ্যমে উত্তম সংবিধানকে কাটছাট করা হয়েছে।[৭]

১.৩.১. ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু সরকারের শাসনভার গ্রহণের সময় যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের পুনর্গঠন

পুনর্বাসন কর্মসূচি : পুনর্বাসনের বিশাল দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে বঙ্গবন্ধু শাসনকার্য শুরু করেছিলেন। ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী প্রায় দেড় কোটি শরণার্থীকে পুনর্বাসন করা, দেশের অভ্যন্তরে ৪৩ লক্ষ বিধ্বস্থ বাসগৃহ পুনঃনির্মাণ করা ছিল সরকারের বিরাট দায়িত্ব। সে সময় প্রশাসনিক কাঠামো ভেঙে পড়েছিল। স্থানীয় পরিষদগুলো ছিল পাকিস্তানপন্থীদের দখলে। নতুন সরকার প্রচুর পরিমাণ আন্তর্জাতিক ত্রাণ সামগ্রী লাভ করলেও সেগুলোর সুষ্ঠু বিতরণ করা বিদ্যমান প্রশাসনিক কাঠামো দিয়ে অসম্ভব ছিল। এমনি পরিস্থিতিতে সরকার রেডক্রস সোসাইটিকে জাতীয় পর্যায় থেকে নিম্নতর স্তর পর্যন্ত পুনর্গঠিত করেন। পাশাপাশি গ্রাম থেকে শুরু করে জেলা পর্যায় পর্যন্ত ত্রাণ কমিটি গঠনের রূপ রেখা প্রণয়ন করে। গ্রামের আয়তন ও লোক সংখ্যার ভিত্তিতে ৫ থেকে ১০ সদস্যের ত্রাণ পুনর্বাসন কমিটি গঠন করা হয়। আওয়ামী লীগপন্থী স্থানীয় কমিটি গঠন করা হয়। এভাবে ইউনিয়ন থানা ও জেলার ত্রাণ কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির সদস্য ও চেয়ারম্যান নিয়োগে প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদের নির্বাচিত সদস্য মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। কমিটিগুলোর মাধ্যমে সারাদেশে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ইউনিয়ন পরিষদগুলোর চেয়ারম্যান সদস্যরা পাকিস্তান আমলে নির্বাচিত হয়েছিলেন এই যুক্তিতে ১৯৭২ সালের ১

জানুয়ারি দেশের সব স্থানীয় প্রশাসন ভেঙ্গে দেওয়া হয়। ফলে ত্রাণ কমিটিগুলো আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ১৯৭৩ সালের ৪ মার্চ সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত আওয়ামী লীগের ক্রোড়পত্রে দাবি করা হয় যে ঐ পর্যন্ত সরকার ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রায় ৯ লক্ষ বাড়িঘর পুনঃনির্মাণ করেছেন। একই সময়ে সামগ্রিক পুনর্বাসন কর্মকাণ্ডে মোট ব্যয় হয়েছিল ২ কোটি ৭৫ লাখ টাকা।[৮]

২. জাতীয়করণ কর্মসূচি : শেখ মুজিব সরকার স্বাধীনতার প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে (২৬-০৩-১৯৭২-এ) পাট, বস্ত্র, চিনিকল ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয়করণের আইন পাশ করে। বাংলাদেশ ব্যাংক জাতীয়করণ আদেশের আওতায় সমস্ত শাখাসহ ১২টি ব্যাংকের দখলিসত্ত্ব সরকার গ্রহণ করে এবং সেগুলো সমন্বয় করে ৬টি নতুন ব্যাংকে রূপান্তরিত হয়। ৩-১-১৯৭২ তারিখে জারিকৃত ভারপ্রাপ্ত উপরাষ্ট্রপতি ১নং আদেশ (A.P.O) এবং ২৮-২-১৯৭২ তারিখে ঘোষিত রাষ্ট্রপতির ১৬ নং আদেশ (PO.16) এর আওতায় অবাঙালি তথা পাকিস্তানি মালিকানার প্রায় ৮৫% শিল্প কলকারখানা ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয় এবং রাষ্ট্র সেগুলোর মালিকানা এবং দখল গ্রহণ করে। এই পরিত্যক্ত সম্পত্তিগুলো জাতীয়করণ আইনের মাধ্যমে রাষ্ট্রয়াত্ত খাত হিসেবে অভিহিত করা হয়। পরিত্যক্ত সম্পত্তি আদেশের (PO.16) আওতায় সম্পত্তির মালিকানা ফিরে পাওয়ার জন্য সরকারের কাছে আবেদন করার সুযোগ ছিল কিন্তু জাতীয়করণকৃত সম্পত্তি ফিরে পাওয়ার কোনো সুযোগ ছিল না। কাউকে সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে সরকারের কোনো ক্ষমতা ছিল না। জাতীয়করণ আইনের আওতায় ৬৭টি পাটকল, ৬৪টি বস্ত্রকল এবং ১৫টি চিনিকল জাতীয়করণ করা হয়। জাতীয় বিমান সংস্থা ও জাতীয় শিপিং সংস্থা যা পূর্বেই আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের অধীনে আনা হয়। এভাবে পরিত্যক্ত ও অনুপস্থিত মালিকদের শিল্প প্রতিষ্ঠান ও বৈদেশিক বাণিজ্য জাতীয়করণ করা হয়। এই জাতীয়করণ কর্মসূচি ছিল সত্তরের নির্বাচনের সময় ঘোষিত আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি। তাছাড়া ছাত্রদের ১১ দফা দাবি ও দেশের পাট, বস্ত্র, চিনিকল ও ব্যাংক বিমা প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয়করণের (৫নং দাবি) দাবি অন্তর্ভুক্ত ছিল। এমনকি ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের ঐতিহাসিক ২১ দফা কর্মসূচিতেও পাটশিল্প জাতীয়করণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।

৩. কৃষি ক্ষেত্রে সংস্কার কার্যক্রম : বঙ্গবন্ধু শাসনভার গ্রহণকালীন সময়ে এদেশের শতকরা ৮৫ ভাগ লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল ছিল। জাতীয় আয়ের অর্ধেকের বেশি ছিল কৃষি নির্ভর। তিনি জানতেন যে কৃষি পণ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে না পারলে দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। এজন্য তিনি সমাজ বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের পর ২২ লক্ষেরও বেশি কৃষক পরিবারকে পুনর্বাসন করার দায়িত্ব দক্ষতার সাথেই পালন করেছিলেন। কৃষি ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু সরকারের সংস্কারসমূহ নিচে উপস্থাপন করা হলো :

১. জমির সমস্ত বকেয়া খাজনা মওকুফসহ ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করা হয় (২৬-৩-১৯৭২)।

২. পরিবার পিছু সর্বাধিক ১০০ বিঘা পর্যন্ত জমি সিলিং নির্ধারণ করা হয়।

৩. পাকিস্তান শাসনামলে রুজু করা ১০ লক্ষ সার্টিফিকেট মামলা থেকে কৃষককে মুক্তি দেওয়া হয় এবং তাদের সকল বকেয়া ঋণ সুদসহ মওকুফ করে দেওয়া হয়।

৪. ১৯৭২ সালের শেষ দিকে হ্রাসকৃত মূল্যে বিভিন্ন কৃষি উপকরণের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৭২ সালের শেষ নাগাদ সারাদেশে হ্রাসকৃত মূল্যে ৪০ হাজার শক্তিচালিত লো লিফট পাম্প, ২৯০০ গভীর নলকূপ ও ৩০০০ অগভীর নলকূপের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে সেচের আওতাধীন জমির পরিমাণ ১৯৬৮-৬৯ সালের তুলনায় ১৯৭৪-৭৫ সালে এক তৃতীয়াংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৬ লক্ষ একরে উন্নীত হয়। সেচ সুবিধা বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃষকদের মধ্যে ১৯৭২ সালেই অধিক ফলনশীল ১৬,১২৫ টন ধানবীজ, ৪৫৪ টন পাট বীজ এবং ১০৩৭টন গমবীজ বিতরণ করা হয়ে। বিশ্ববাজারের চেয়ে হ্রাসকৃত মূল্যে সার সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। ফলে ১৯৭৩-৭৪ সালে রাসায়নিক সারের ব্যবহার গড়ে ৭০ শতাংশ, কীটনাশক ৪০ শতাংশ, উন্নত বীজ ২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়।

৫. ধান পাট তামাক এবং আখসহ গুরুত্বপূর্ণ কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে এসব পণ্যের ন্যূনতম ন্যায্য বিক্রয়মূল্য ধার্য্য করে দেওয়া হয়।

৬. কৃষি গবেণষাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। কৃষি বিষয়ক উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলো পুনর্গঠনের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গৃহীত হয়।

৭. ১৯৭৩ সালে আট মাসের মধ্যে গঙ্গা কপোতাক্ষ সেচ প্রকল্প পুরোপুরি চালুর ব্যবস্থা করা হয়।

৮. ফারাক্কা বিষয়ে আলোচনার জন্য বঙ্গবন্ধু বিশিষ্ট পানি বিজ্ঞানী বি এস আব্বাসকে ২১.১.৭২ তারিখে দিল্লি পাঠান এর জন্য শুকনো মওসুমে পদ্মা নদীতে ৪৫.০০০ কিউসেক পানি সরবরাহের নিশ্চয়তা লাভ করেন।

৯. সরকারিভাবে খাদ্য মজুত গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের মধ্যেই ১০০টি খাদ্যগুদাম নির্মাণ করা হয়।

১০. কৃষকদের মধ্যে ১ লক্ষ বলদ ও ৫০ হাজার গাভী এবং ৩০ কোটি টাকার কৃষি ঋণ বিতরণ করা হয়।

কৃষি উন্নয়নে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করার জন্য বঙ্গবন্ধু সরকার জাতীয় পর্যায়ে সেরা কৃষকদের জন্য 'বঙ্গবন্ধু পুরস্কার' নামে পুরস্কার ঘোষণা করেন।[৯]

৪. শিক্ষা সংস্কার কার্যক্রম : দেশের মানব সম্পদ উন্নয়নের উপর জাতীয় অগ্রগতি নির্ভরশীল। বঙ্গবন্ধু সেই যুদ্ধবিধ্বস্ত পরিবেশেও মানব সম্পদের উন্নতির লক্ষ্যে শিক্ষার বিকাশের উপর জোর দেন। এমনকি ১৯৭২ সালের সংবিধানেও সর্বজনীন শিক্ষা প্রবর্তনের অঙ্গীকার সন্নিবেশিত হয়েছিল। এগুলো হলো–

১. এই পদ্ধতি গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং আইনের দ্বারা নির্বাচিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদানের জন্য।

২. সমাজের প্রয়োজনের সাথে শিক্ষাকে সংগতি করার জন্য এবং সেই প্রয়োজন সিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে যথাযথ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সদিচ্ছা প্রাণোদিত নাগরিক সৃষ্টির জন্য।

৩. আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

শাসনভার গ্রহণের মাত্র ছয় মাসের মধ্যেই বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে 'বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন' নিয়োগ করেন। কুদরত ই খুদা কমিশন দেড় বছর কঠোর পরিশ্রম করে ব্যাপক জরিপ ও পর্যালোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের শিক্ষা সংস্কারের একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা সংবলিত একটি রিপোর্ট ১৯৭৪ সালের ৩০ মে সরকারের নিকট দাখিল করেন।

কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষা নীতি ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ শেখ মুজিব নিয়েছিলেন। কমিশন রিপোর্টের পূর্বেই তিনি কতিপয় জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।[১০] এগুলো হচ্ছে ১. মার্চ ১৯৭১ সাল থেকে ডিসেম্বর ৭১ পর্যন্ত সময়কালে ছাত্রদের সকল বকেয়া টিউশিন ফি মাফ করা।

২. শিক্ষকদের ৯ মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধ করা,

৩. আর্থিক সংকটে থাকা সত্ত্বেও পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ করা এবং অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক ঘোষণা করা,

৪. বঙ্গবন্ধুর যুগান্তকারী পদক্ষেপ হচ্ছে, তিনি দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারিকরণ করেছিলন। এর ফলে ১ লক্ষ ৬৫ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকুরি সরকারি হয়।

(ঙ) ১০০ কলেজ ভবন ও ৪০০ হাইস্কুল ভবন পুনঃনির্মাণ করা হয়।

(চ) জাতীয় সংসদে ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ করার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে স্বায়ত্ত্বশাসন প্রদান করা।

বঙ্গবন্ধু অফিস আদালতে বাংলা ভাষা প্রচলনের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। সেনাবাহিনীর সকল অফিসে বাংলা চালু করা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলা একাডেমিতে সাঁটলিপি মুদ্রাক্ষর ও নথি লেখার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু

৩. আইনের দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

শাসনভার গ্রহণের মাত্র ছয় মাসের মধ্যেই বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. কুদরত-ই-খুদার নেতৃত্বে 'বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন' নিয়োগ করেন। কুদরত ই খুদা কমিশন দেড় বছর কঠোর পরিশ্রম করে ব্যাপক জরিপ ও পর্যালোচনার মাধ্যমে বাংলাদেশের শিক্ষা সংস্কারের একটি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা সংবলিত একটি রিপোর্ট ১৯৭৪ সালের ৩০ মে সরকারের নিকট দাখিল করেন।

কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের মাধ্যমে জাতীয় শিক্ষা নীতি ঢেলে সাজানোর উদ্যোগ শেখ মুজিব নিয়েছিলেন। কমিশন রিপোর্টের পূর্বেই তিনি কতিপয় জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।[১০] এগুলো হচ্ছে ১. মার্চ ১৯৭১ সাল থেকে ডিসেম্বর ৭১ পর্যন্ত সময়কালে ছাত্রদের সকল বকেয়া টিউশিন ফি মাফ করা।

২. শিক্ষকদের ৯ মাসের বকেয়া বেতন পরিশোধ করা,

৩. আর্থিক সংকটে থাকা সত্ত্বেও পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সকল শিক্ষার্থীকে বিনামূল্যে পুস্তক বিতরণ করা এবং অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক ঘোষণা করা,

৪. বঙ্গবন্ধুর যুগান্তকারী পদক্ষেপ হচ্ছে, তিনি দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারিকরণ করেছিলন। এর ফলে ১ লক্ষ ৬৫ হাজার প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকুরি সরকারি হয়।

(ঙ) ১০০ কলেজ ভবন ও ৪০০ হাইস্কুল ভবন পুনঃনির্মাণ করা হয়।

(চ) জাতীয় সংসদে ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ করার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে স্বায়ত্ত্বশাসন প্রদান করা।

বঙ্গবন্ধু অফিস আদালতে বাংলা ভাষা প্রচলনের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। সেনাবাহিনীর সকল অফিসে বাংলা চালু করা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলা একাডেমিতে সাঁটলিপি মুদ্রাক্ষর ও নথি লেখার প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু

করা হয়। জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ দিয়ে তিনি বাংলা ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছিলেন।[১১]

৫. অর্থনৈতিক সংস্কার : বঙ্গবন্ধু শাসনভার গ্রহণের পরপরই নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নে পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সরকার ১৯৭২ সালের জানুয়ারী মাসে একটি পরিকল্পনা কমিশন গঠন করে। ১৯৭৩ সালের ১১ জুলাই থেকে প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনা (১৯৭৩-৮৭) কার্যকর হয়। প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনায় যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের বিষয়টি গুরুত্ব লাভ করেছিল।[১২] এর দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য ছিল বৈষম্যমুক্ত সমৃদ্ধ এক বাংলাদেশ গড়ে তোলা। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যসমূহ বিশ্লেষণ করলে আমরা ঐ কমিশনের চেয়ারম্যান প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অর্থনৈতিক উন্নয়ন দর্শন সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারি। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনের বিষয়টি গুরুত্ব লাভ করেছিল। এই দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য ছিল বৈষম্যহীন সমৃদ্ধ এক বাংলাদেশ গড়ে তোলা। প্রথম পঞ্চবার্ষিকীর লক্ষ্য ছিল নিম্নরূপ:[১৩]

ক. পরিকল্পনার প্রধান লক্ষ্য হবে দারিদ্র্য হ্রাস । আর লক্ষ্য অর্জনের কৌশল হিসেবে বলা হয়েছিল কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি এবং সমতা ভিত্তিক বণ্টন নিশ্চিত করার জন্য কার্যকর আর্থিক ও দ্রব্যমূল্য সংশ্লিষ্ট নীতিমালা।

খ. অর্থনীতির প্রতিটি খাতে বিশেষত কৃষি ও শিল্পের পুনর্গঠন ও উৎপাদন বৃদ্ধি।

গ. অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার ৩% থেকে ৫.৫% এ উন্নীত হয়। আর আনুষ্ঠানিক খাতসমূহের কর্মসংস্থান বৃদ্ধির পাশাপাশি উন্নয়নে স্বেচ্ছাশ্রমের বিকাশ। মানব শক্তি ও অর্থনৈতিক সম্পদের সর্বোচ্চ বিকাশের লক্ষ্যে উন্নয়নমুখী স্থানীয় সরকার কাঠামো শক্তিশালী করা।

ঘ. নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যপণ্য (বিশেষ করে খাদ্য, বস্ত্র, ভোজ্য তেল, কেরোসিন, চিনি) উৎপাদন বৃদ্ধি এবং এসবের বাজার মূল্য দরিদ্র জনগোষ্ঠীর হাতের নাগালে রাখা এবং স্থিতিশীল করা (কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে)

ঙ. বণ্টন নীতিমালা (পুনর্বণ্টমূলক আর্থিক নীতিকৌশল) এমন রাখা যাতে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধির হার গড় আয় বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি হয়। (এবং উচ্চ আয়ের মানুষদের এক্ষেত্রে ত্যাগ স্বীকার করাতে হবে)।

চ. অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে রাষ্ট্রের ভূমিকা তার ব্যবস্থাপনা ও সাংগঠনিক যোগ্যতা দক্ষতার ভিত্তিতে নিরূপণ করা, গ্রাম শহরে স্বকর্মসংস্থান সুযোগ বৃদ্ধি করা অর্থনীতির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর জনকল্যাণকামী পরিবর্তন সাধন করা।

ছ. বৈদেশিক সাহায্যের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করা। স্বনির্ভরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ সম্পদের সর্বোচ্চ সমাবেশ নিশ্চিত করা। বৈদেশিক মুদ্রার আহরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে রপ্তানি কর্মকাণ্ড সম্প্রসারণ ও বহুমুখী করা এবং আমদানি কাঠামো পুনর্বিন্যাস করা। বিশেষ করে সার, সিমেন্ট এবং স্টিলের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে বিদেশ নির্ভরতাভিত্তিক অনিশ্চয়তা হ্রাস করা।

জ. কৃষির প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তন নিশ্চিত করে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা।

ঝ. জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাস, রাজনৈতিক নেতৃত্বের কমিটমেন্ট এবং সামাজিক চেতনা বিকাশ প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা।

ঞ. শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গ্রামীণ গৃহায়ণ, পানি সরবরাহ ইত্যাদি খাতে উন্নয়ন বরাদ্দ বৃদ্ধির মাধ্যমে মানুষের সাধারণ সক্ষমতা ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা।

যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

ক. প্রথম পাঁচশালা (১৯৭৩–৭৮) পরিকল্পনায় বিদেশি সাহায্যের নির্ভরশীলতা ৬২% থেকে ১৯৭৭-৭৮ এর মধ্যে ২৭% এ কমিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেন।

খ. তিনি নতুন চারটি কর্পোরেশন গঠন করেন। যেমন– ১. বাংলাদেশ জুট কর্পোরেশন ২. বাংলাদেশ সুগার কর্পোরেশন ৩. বাংলাদেশ টেক্সটাইল কর্পোরেশন এবং বাংলাদেশ গ্যাস অ্যান্ড ওয়েল কর্পোরেশন।

৩. বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা ও বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন এবং বিভিন্ন ব্যাংকের ১০৫০টি নতুন শাখা স্থাপন করেন।

৪. বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন এবং ৩৩৫টি শাখা স্থাপন করেন।

৫. স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য নতুন মুদ্রা চালু করেন।

৬. তিনি ১৯৭৪ সালের বাংলাদেশের জন্য সাহায্যদাতা গোষ্ঠী গঠন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

৭. গ্রাম বাংলার উন্নয়নের লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু সমন্বিত পল্লি উন্নয়ন কর্মসূচি (IRDP) এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং বগুড়ায় পল্লি উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন।

৮. বঙ্গবন্ধু ঘোড়াশাল সার কারখানা, আশুগঞ্জ কমপ্লেক্সের প্রাথমিক কাজ ও অন্যান্য নতুন শিল্প স্থাপন, বন্ধ শিল্পকারখানা চালু করাসহ অন্যান্য সমস্যা মোকাবিলা করে একটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে অর্থনৈতিক অবকাঠামো তৈরি করে দেশকে ধীরে ধীরে একটি সমৃদ্ধশালী রাষ্ট্রে পরিণত করার জোর প্রয়াস গ্রহণ করেন।[১৪]

৯. সরকারি কর্মচারি ও শ্রমিকদের কল্যাণার্থে ব্যবস্থা গ্রহণ : বঙ্গবন্ধু শাসনভার গ্রহণের সময় রাষ্ট্রীয় কোষাগারে যে অর্থ ছিল তা দিয়ে প্রশাসনিক কর্মকর্তা কর্মচারিদের বেতন দেয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু তবুও সদ্য স্বাধীন দেশের মানুষের আকাঙ্ক্ষার পরিপূরক হিসেবে বঙ্গবন্ধু সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারিদের জন্য নুতন বেতন কমিশন গঠন করে ১০ স্তরবিশিষ্ট নতুন বেতন স্কেল বাস্তবায়ন করেন। তিনি শ্রমিকদের জন্যও নতুন বেতন কাঠামো ঘোষণা করেছিলেন। শ্রমিকদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য বঙ্গবন্ধু আন্তরিক ছিলেন। ১৯৭২ সালের ১ মে তিনি (মে দিবসে) শ্রমিকদের মজুরি হার বৃদ্ধির ঘোষণা দেন।[১৫]

১০. সড়ক ও রেলপথ উন্নয়ন : মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রায় ধ্বংস হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের দিকেও গুরুত্ব দেন। তিনি ১৯৭৪ সালের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের সময়

ধ্বংসপ্রাপ্ত সকল ব্রিজ, সেতু পুনর্নির্মাণ করেন এবং অতিরিক্ত ৯৭টি নতুন সড়ক সেতু নির্মাণ করেন। সে সময় ধ্বংসপ্রাপ্ত রেল সেতুগুলো চালু করা হয়। যমুনা নদীর উপর সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা ছিল বঙ্গবন্ধুর এক বৈপ্লবিক প্রয়াস। তার উদ্যোগে গঠিত কমিশন ১৯৭৪ সালের ৪ নভেম্বর যমুনা সেতুর প্রাথমিক সম্ভাব্যতা রিপোর্ট প্রণয়ন করে।

১১. বিমান ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে উন্নয়ন : বঙ্গবন্ধুর সময়ে ১৯৭২ সালের ৭ মার্চের মধ্যে ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-সিলেট, ঢাকা-যশোর ও ঢাকা-কুমিল্লা রুটে বিমান চালুর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। আন্তর্জাতিক রুটেও একটি বোয়িং সংযোজিত হয় এবং ১৯৭৩ সালের ১৮ জুন ঢাকা লন্ডন রুটে বিমানের প্রথম ফ্লাইট চালু হয়। কুর্মিটোলায় আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর নির্মাণের কাজ শুরু হয় বঙ্গবন্ধু শাসনামলে।

১২. সমুদ্র ও নৌপরিবহণ ক্ষেত্রে উন্নয়ন : বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন গঠিত হয়। এই শিপিং কর্পোরেশন ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই কোস্টারসহ ১৪টি সমুদ্রগামী জাহাজ সংগ্রহ করে।

১৩. বিদ্যুৎ ব্যবস্থার উন্নয়ন : মুক্তিযুদ্ধকালীন সারাদেশে বিদ্যুৎ সাব-স্টেশনগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। অনেক স্থানে বিদ্যুৎ লাইন বিচ্ছিন্ন ও বিদ্যুৎ পোলগুলো বিনষ্ট হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু সরকার দায়িত্ব গ্রহণের সময় গোডাউনগুলোতে বিদ্যুৎ খুঁটি, তার কিছুই মজুত ছিল না। এগুলো ছিল আমদানিযোগ্য পণ্য। এমনি পরিস্থিতিতে বঙ্গবন্ধুর সরকার বিদ্যুৎ উৎপাদান ও বিতরণের ক্ষেত্রে কৃতিত্ব অর্জন করেন। তিনি ৫০০০ বিদ্যুৎ পোল আমদানি করেন এবং ১৯৭২ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ১৫০০০ কি. মি বিদ্যুৎ লাইন স্থাপন করেন। বিদ্যুতের উৎপাদন ১৯৭২ সালে জানুয়ারিতে উৎপাদিত ২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ থেকে ডিসেম্বরে ৫০০ মেগাওয়াটে উন্নীত করেন। বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে ১৯৭৩ সালে দেশব্যাপী পল্লিবিদ্যুৎ কর্মসূচি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে একটি মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা হয় এবং সংবিধানের ১৬ অনুচ্ছেদে পল্লি বিদ্যুতায়নের প্রতিশ্রুতি সন্নিবেশিত হয়।

১৪. টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন : মুক্তিযুদ্ধের সময় বাংলাদেশের টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর সরকার ১৯৭৪ সালের

ডিসেম্বর মাসের মধ্যেই ৫৫,০০০ টেলিফোন চালুর ব্যবস্থা করেন। বহির্বিশ্বের সাথে টেলিযোগাযোগ স্থাপনের জন্য বঙ্গবন্ধু পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র স্থাপনের কাজ সমাপ্ত করেন।[১৬]

১৫. ১৯৭৩ সালের সাধারণ নির্বাচন : বাংলাদেশের সংবিধান কার্যকর হবার পর (১৬-২-৭২) গণপরিষদ ভেঙে দেয়া হয় এবং সরকার ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা জারি করেন। নির্বাচনের তারিখ ঘোষিত হওয়ার পর প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ভাসানী) সভাপতি মওলানা ভাসানী নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার উৎখাতের আহ্বান জানান (৩১-১২-১৯৭২)। জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) জন্মলগ্ন থেকেই সরকার বিরোধী কর্মকাণ্ড শুরু করে। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (মোজাফফর) ও বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি সরকারের প্রতি নমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করে। ডানপন্থি রাজনৈতিক দলগুলোর তৎপরতা সে সময় নিষিদ্ধ ছিল। নির্বাচনে জাতীয় সংসদের মহিলা আসনসহ ৩১৫টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ৩০৬টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) ২টি, বাংলাদেশ জাতীয়লীগ ১টি এবং স্বতন্ত্র সদস্যরা ৬টি আসনে জয় লাভ করেন।

১৬. আদমশুমারি অনুষ্ঠিত : বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের আর্থিক সঙ্কট ও নানা ব্যস্ততার মাঝেও ১৯৭৪ সালের ৮ জুন বাংলাদেশের প্রথম আদমশুমারি সম্পন্ন করেন।[১৭]

১৭. সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গৃহীত পদক্ষেপ : (ক) সরকার গঠনের তিন দিনের মধ্যেই (১৫-১-১৯৭২) বঙ্গবন্ধু এক সরকারি আদেশের মাধ্যমে দেশে মদ, জুয়া, হাউজি ও ঘোড়াদৌড় নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন। তিনি একই সাথে ঢাকা রেসকোর্স ময়দানকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান হিসেবে ঘোষণা করেন।

(খ) বঙ্গবন্ধু ২৪-৫-১৯৭২ তারিখে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে সপরিবারে ঢাকায় আনেন।

(গ) ১৯৭৪ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে বঙ্গবন্ধু ৯টি বন্ধু রাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক চুক্তি সম্পাদন করেন।

(ঘ) তিনি ঢাকায় শিল্পকলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেন।

(ঙ) ১৯৭৫ সালের ৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু ঢাকার রামপুরায় বাংলাদেশ টেলিভিশনের স্থায়ী নতুন ভবন উদ্বোধন করেন :

(চ) ধর্ম নিরপেক্ষতা মানে ধর্মহীনতা নয় : এই আদর্শে বিশ্বাসী বঙ্গবন্ধু ইসলাম সম্পর্কে গবেষণার লক্ষ্যে ২০-৩-১৯৭৫ তারিখে ইসলামি ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠার জন্য এক অধ্যাদেশ জারি করেন। তিনি মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড পুনর্গঠন করেন। বাংলাদেশ তাবলীগ জামাতের কেন্দ্র কাকরাইল মসজিদ সম্প্রসারণের ব্যবস্থা করেন। টঙ্গীতে তাবলীগের বিশ্ব ইজতেমার স্থান করে দেন।

(ছ) ১৫-১২-১৯৭৪ তারিখে বঙ্গবন্ধু দুস্থ শিল্পী সংস্কৃতিসেবীদের কল্যাণার্থে সরকারিভাবে বঙ্গবন্ধু সংস্কৃতিসেবা, কল্যাণ ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন।

(জ) ৭-৮-৭৫ তারিখে দুস্থ ক্রীড়াবিদদের কল্যাণার্থে বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন গঠিত হয়।[১৮]

১৮. নারীদের কল্যাণে গৃহীত ব্যবস্থা : বঙ্গবন্ধু দুস্থ মহিলারদের কল্যাণের জন্য ১৯৭২ সালে নারী পুনর্বাসন বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭৪ সালে এই বোর্ডের কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করে নারী পুনর্বাসন কল্যাণ ফাউন্ডেশন সৃষ্টি করেন। চাকরির সকল ক্ষেত্রে নারীর জন্য তিনি ১০ ভাগ কোটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন। নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে তিনি ড. নীলিমা ইব্রাহীমকে বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক হিসেবে নিয়োগ দেন এবং মিসেস বদরুন্নেসা আহমেদ ও বেগম নূরজাহান মুরশিদকে মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত করেন।

১৯. প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ়করণে পদক্ষেপ গ্রহণ : সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার দিকেও বঙ্গবন্ধুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তার সরকারের আর্থিক সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও তিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে আধুনিক ও শক্তিশালী করার চেষ্টা করেন। ৬-৩-১৯৭২

তারিখে তিনি বিডিআর গঠনের আদেশ জারি করেন। বঙ্গবন্ধু ৮-৪-১৯৭২ তারিখে পদাতিক বাহিনী, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী গঠনের লক্ষ্যে একটি অধ্যাদেশ জারি করেন। ১১-৩-১৯৭৪ তারিখে তিনি কুমিল্লায় বাংলাদেশ প্রথম সামরিক একাডেমী উদ্বোধন করেন। বঙ্গবন্ধু যুগোশ্লাভিয়া থেকে ক্ষুদ্র অস্ত্রশস্ত্র ও সাজোয়া বাহিনীর জন্য ভারী অস্ত্র সংগ্রহ করেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে সংগ্রহ করেন মিগ বিমান, হেলিকপ্টার ও পরিবহন বিমান। তিনি ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য থেকে বিমান বাহিনীর জন্য হেলিকপ্টার ক্রয় করেন। তার একান্ত ব্যক্তিগত উদ্যোগে মিশর থেকে সংগৃহীত হয় সাজোয়া গাড়ি বা ট্যাংক (যা পরবর্তীকালে তাকে হত্যা করতে খুনিরা ব্যবহার করে)। সেনাবাহিনীর জন্য পোশাক ও যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য বঙ্গবন্ধু সরকার ভারতের কাছ থেকে ৩ কোটি টাকা অনুদান হিসেবে লাভ করেন। উন্নত প্রশিক্ষণ লাভের জন্য বঙ্গবন্ধু সামরিক অফিসারদের বিদেশে প্রেরণ করেন। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তান থেকে প্রত্যাবর্তনকারী ৩০ হাজারের অধিক সামরিক কর্মকর্তা ও জওয়ানদের বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে পুনর্বাসিত করেন।

২০. মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে গৃহীত ব্যবস্থা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন : বঙ্গবন্ধু প্রতিটি শহিদ পরিবারকে আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করেন। মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য তিনি গঠন করেন মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট। ১৫-১-৭৩ তারিখে বন্ধুবন্ধুর নির্দেশে মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের রাষ্ট্রীয় বিশেষ খেতাব প্রদানের তালিকা সরকারি গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। বঙ্গবন্ধু ৭ জন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে বীরশ্রেষ্ঠ, ৬৮ জনকে বীর উত্তম, ১৭৫ জন মুক্তিযোদ্ধাকে বীরবিক্রম এবং ৪২৬ জন মুক্তিযোদ্ধাকে বীরপ্রতীক পদক প্রদান করেন। তাছাড়াও মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ অবদান রাখার জন্য মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি কর্ণেল (অব.) আতাউল গনি ওসমানীকে জেনারেল এবং চিপ অফ স্টাফ কর্ণেল (অব.) আবদুর রবকে মেজর জেনারেল পদে ভূষিত করেন।

২১. অস্ত্র সমর্পণের আয়োজন : জেল থেকে বের হয়ে এসে আমি দেখেছিলাম রেলওয়ে ভেঙে গেছে, চালের গুদাম নাই, দোকানে মাল নাই, ব্যাংকের টাকা জ্বালিয়ে দিয়েছে, বৈদেশিক মুদ্রা লুট করে নিয়েছে। আমি

আরও দেখেছিলাম মানুষের কাছে বন্ধুক। আমার দেশের লোক আমাকে ভালোবাসে। তাই আমার সহকর্মীরা বললেন, তোমাকেই সব কিছুর ভার নিতে হবে। তার ফলে আমি প্রধানমন্ত্রীত্ব নিতে বাধ্য হলাম। বিশেষ করে এই জন্য যে, আমার বাংলার স্বীকৃতি দরকার। আমি বাংলাদেশের মানুষের কাছে আবেদন জানালাম, তোমাদের অস্ত্র ফেরত দাও। সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে আমার বাংলার মুক্তিযোদ্ধারা দুই লক্ষ অস্ত্র আমার হাতে দিয়েছে। অস্ত্র সমর্পণের এমন নজির পৃথিবীর ইতিহাসে আর দেখা যায়নি।[১৯]

২২. শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি : যদি কারখানা চালিয়ে উৎপাদন না করতে পারেন আমি বেতন বাড়াব কোথা থেকে। আপনারা আমার কাছে চান নাই আমার কাছে দাবি করার দরকারও নাই। আমি আপনাদের জন্য জীবনভর দাবি করেছি। আমার কাছে আপনারা কী দাবি করবেন? আপনারা না বললেও আমি ২৫ টাকা বেতন বাড়িয়ে দিয়েছি। তাতে ৩৫ কোটি টাকা বেতন বাড়াতে হয়েছে। শ্রমিকদের কর্তব্য হলো উৎপাদন করা।[২০]

২৩. শিল্প ব্যবস্থাপনা : আমি এখানে আজ আর একটা ঘোষণা করছি, সরকার যেসব কারখানা জাতীয়করণ করেছেন এখন থেকে সেগুলোর প্রত্যেকটির ম্যানেজমেন্ট বোর্ড দুইজন করে সদস্য থাকবে এবং শ্রমিকরা নির্বাচনের মাধ্যমে এ সদস্যদের বোর্ড পাঠাবেন। এ ছাড়া বোর্ড সরকারের এবং ব্যাংকের পক্ষ থেকে তিনজন সদস্য থাকবেন এবং পাঁচজন বসে কারখানা চালাবেন। যাই আয় হোক না কেন আদমজি দাউদ বা আমিনের পকেটে যাবে না। আয়ের একটি অংশ আপনারা নিবেন, আর বাকি অংশ দেশের কৃষকদের কাছে যাবে। কারণ আপনারা হলেন শতকরা একজন বা দেড়জন আর বাংলার কৃষক হলো শতকরা ৮৫ জন। তাদের টাকা দিয়ে শিল্পকারখানা চালানো হয়। তাদেরও ভোগ করার অধিকার রয়েছে। আপনাদের দেখতে হবে যে ৮ ঘণ্টার জায়গায় লাল বাহিনীর ছেলেরা ১০ ঘণ্টা পরিশ্রম করে এবং এ কাজ দেখিয়ে অন্য শ্রমিকদের উৎসাহ দিতে হবে। আপনারা ১০ ঘণ্টা না পারেন, ৯ ঘণ্টা বা ৮ ঘণ্টা কাজ করেন, উৎপাদন বাড়ান। তাহলেই লাল বাহিনীর নিকট আপনাদের ইজ্জত থাকবে। লাল টুপি মাথায় দিয়ে বেড়ালে লাল বাহিনীর ইজ্জত পাওয়া যাবেনা।[২১]

২৪. ন্যায্যমূল্যে দ্রব্য ক্রয়ের ব্যবস্থা : ভাইয়েরা আমরা আজ আপনাদের বেতন বাড়ালেই সুবিধা হবে না। সেইজন্য বাংলাদেশের ৪,২০০ দোকান খোলা হচ্ছে। প্রত্যেক ইউনিয়নে একটা করে ন্যায্যমূল্যে জিনিসপত্র দেয়ার জন্য; শ্রমিক এলাকায়ও এ ধরনের দোকান খোলা হবে। তাতে খরচ হবে ১ কোটি টাকা। তবে মজুতদার চোরাকারবারী আর চোরাচালানকারীরা হুশিয়ার হয়ে যাও। আজ মুনাফাখোর, আড়তদার, চোরাকারবারী সাবধান হয়ে যাও। ভবিষ্যতে যদি জিনিসের দাম আর বাড়ে, আমি তোমাদের শেষ করে দিব কারফিউ করে। আর দরকার যদি হয় আইন পাস করবো। যদি চোরাকারবারী বা আড়তদার আমার কথা না শোনে তাদের ছাড়ব না।

২৫. বাঙালি জাতীয়তাবাদ মজবুত করা : এখন আমাদের একটি শ্লোগান, আগে ছিল ৬ দফা, এখন বলি ৪টা স্তম্ভ। আমার বাংলার সভ্যতা, আমার বাঙালি জাতি এনিয়ে হলো বাঙালি জাতীয়তাবাদ। বাংলার বুকে জাতীয়তাবাদ থাকবে। এ হলো আমার এক নম্বর স্তম্ভ।[২২]

২৬. সমাজতন্ত্রের বিকাশ : দ্বিতীয় স্তম্ভ বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র : এ সমাজতন্ত্র আমি দুনিয়া থেকে ভাড়া করে আনতে চাই না। এ সমাজতন্ত্র বাংলার মানুষের সমাজতন্ত্র। তার অর্থ হলো শোষণহীন সমাজ, সম্পদের সুষম বণ্টন। বাংলাদেশের ধনীদের আমি আর সম্পদ বাড়তে দিব না। বাংলার কৃষক, মজদুর, বাংলার বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক এদেশে সমাজতন্ত্রের সুবিধা ভোগ করবে।[২৩]

৭. গণতন্ত্রের ধারক : কিন্তু সমাজতন্ত্র যেখানে আছে, সেদেশে গণতন্ত্র নেই। আমি বাংলার মাটি থেকে দেখতে চাই যে, গণতন্ত্রের মাধ্যমে আমি সমাজতন্ত্র কায়েম করব। আমি ব্যক্তি স্বাধীনতায় বিশ্বাস করি। আমি জনগণকে ভালোবাসি আমি জনগণকে ভয় পাইনা। দরকার হলে আবার ভোটে যাব। গণতন্ত্র বাংলায় অবশ্যই থাকবে।[২৪]

২৮. ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গঠনের উদ্যোগ : চতুর্থত, বাংলাদেশে মুসলমানরা ধর্ম পালন করবে, হিন্দু তার ধর্ম পালন করবে। খ্রিষ্টান তার ধর্ম

পালন করবে। খ্রিষ্টান তার ধর্ম পালন করবে। বৌদ্ধও তার নিজের ধর্ম পালন করবে। এ মাটিতে ধর্মহীনতা নাই, ধর্মনিরোপেক্ষতা আছে। এর একটা মানে আছে। এখানে ধর্মের নামে ব্যবসা চলবে না। ধর্মের নামে রাজনীতি করে রাজাকার আলবদর পয়দা করা বাংলার বুকে আর চলবে না। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি করতে দেয়া হবে না। এগুলো চারদফা, চার স্তম্ভ।[২৫]

২৯. ঘুষ দুর্নীতির বিরুদ্ধে অবস্থান : কর্মী ভাইয়েরা গ্রামে গ্রামে তোমরা পাহাড়া দাও যাতে চোর, গুণ্ডা, বদমাইশ মানুষের শান্তি শৃঙ্খলা নষ্ট করতে না পারে। আর যারা শুধু সমালোচনা করে, বক্তৃতা করে, তাদের কাছে অনুরোধ করি, গ্রামে গিয়ে একটু কাজ করুন, একটু রিলিফের কাজ করুন। তাতে ফল ভালো হবে।

৩০. আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ : বাংলাদেশ আজ জাতিসংঘের সদস্য। বাংলাদেশ আজ জোট নিরপেক্ষ গোষ্ঠীর সদস্য, কমনওয়েলথের সদস্য, ইসলামি সামিটের সদস্য। আমরা দুনিয়ার সব রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব চাই। আমি চেয়েছিলাম পাকিস্তানিরা নিশ্চয়ই দুঃখিত হবে। আমার সম্পদ ফেরত দেবে। আমি ওয়াদা করেছিলাম তাদের বিচার করব। এ ওয়াদা আপনাদের পক্ষ থেকে খেলাপ করেছি, আমি বিচার করিনি। আমি ছেড়ে দিয়েছি এই জন্য যে এশিয়ায়, দুনিয়াতে আমি বন্ধুত্ব চেয়েছিলাম। আমি যখন বাংলাদেশ সরকার পেলাম, যখন জেল থেকে বের হয়ে এলাম। তখন আমি শুধু বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষই পেলাম। ব্যাংকে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা ছিল না। আমাদের গোল্ড রিজার্ভ ছিল না। শুধু কাগজ নিয়ে আমরা সাড়ে সাত কোটি লোকের সরকার যাত্রা শুরু করলাম। আমাদের গুদামে খাবার ছিল না গত তিনচার বছরে না হলেও বিদেশ থেকে ২২ কোটি মন খাবার বাংলাদেশে আনতে ২২ শো কোটি টাকার মতো বিদেশ থেকে সাহায্য পেয়েছি। সেজন্য যারা আমাদের সাহায্য করেছেন সেসব বন্ধু রাষ্ট্রকে আমরা ধন্যবাদ জানাই।

৩১. অন্যান্য উদ্যোগ : বঙ্গবন্ধু দেশে ফেরার দিন কয়েকের মধ্যে দেশে পার্লামেন্টারি প্রথার সরকার ব্যবস্থা চালু করে তিনি প্রধানমন্ত্রী তথা সরকার

প্রধানের দায়িত্ব আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করেন। এ দায়িত্বে নিযুক্ত থাকার সময় অনেকগুলো কঠিন কাজ করেছেন। এগুলোর মধ্যে প্রধানতম হলো :

ক. চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দরের মুখে পাকিস্তানিরা যে হাজার হাজার মাইন পেতে রেখেছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তায় সেগুলোর অপসারণ করে বন্দর দুটিতে জাহাজ চলাচল শুরু করা। খাদ্য ও সাহায্য সামগ্রী আমদানির জন্য এ কাজটি খুবই জরুরি ছিল।

খ. চীন ছাড়া বিশ্বের বৃহৎ শক্তিসমূহের এবং সৌদি আরব ছাড়া অন্য প্রায় সব দেশের কাছ থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতি লাভ করা।

গ. পাকিস্তান থেকে সামরিক বেসামরিক সব বাংলাদেশীকে ফিরিয়ে আনা।

ঘ. ১৯৭১ সালের যুদ্ধে দেশের ধ্বংসপ্রাপ্ত রাস্তাঘাট, সেতু ও ট্রেন লাইনগুলোকে চালু করা।

ঙ. দেশের উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য বৈদেশিক সাহায্য আনা এবং

চ. দেশের জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করা।

উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায় যে, জাতির এ মহান স্থপতির যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠন সংক্রান্ত উপরের উদ্যোগ পুরোপুরি সফল হবার আগেই ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘাতকের বুলেট তার প্রাণ কেড়ে নেয়। শেখ মুজিবের মতো এত বড় নেতাকে এভাবে হত্যার মাধ্যমে জাতির জন্য বয়ে নিয়ে আসে দুর্ভাগ্যের কালো মেঘ।

১.৪.১. ১৫ আগস্ট সামরিক অভ্যুত্থান এবং শেখ মুজিবুর রহমানের পতন

বঙ্গবন্ধু তাঁর স্বল্পকালীন শাসনামলে যা করেছেন বা করার চেষ্টা করেছেন সবই ছিল দেশের মানুষের কল্যাণে ও তাদের মুক্তির জন্য। তা সত্ত্বেও তিনি সমালোচনার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেননি। তার অনেকগুলো কাজ

সমালোচিত হয়েছে। বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রবর্তন, রক্ষীবাহিনী গঠন, বাকশাল গঠন, ভারত বাংলাদেশ চুক্তি তার অন্যতম সমালোচিত কাজ। সমালোচকদের সমালোচনার রসদ জুগিয়েছে ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ। নিম্নে এ বিষয়গুলো বিস্তারিত আলোচনা করা হলো :

১. রক্ষীবাহিনী গঠন : বঙ্গবন্ধু ৭ মার্চ, ১৯৭২ সালে জাতীয় রক্ষী বাহিনী আদেশ ১৯৭২ জারি করেন এবং তা ফেব্রুয়ারি, ১৯৭২ থেকে কার্যকর বলে গণ্য হয়। মুক্তিযুদ্ধের পরপর পুলিশ, ইপিআর, আনসার, সেনা, নৌ, বিমান-কোনো বাহিনীতেই তখন পর্যন্ত পুরোপুরি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বঙ্গবন্ধু ক্ষমতা গ্রহণের পর দেশের শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য উপযুক্ত ও সুসংগঠিত কোনো বাহিনীই ছিল না। বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করার জন্য সেনাবাহিনীর সাহায্য লাভের সুযোগও ছিল অত্যন্ত সীমিত। এমতাবস্থায় সময়ের প্রয়োজনেই জাতীয় রক্ষী বাহিনী গঠন করা হয়। মূলত ফটকা কারবারী, চোরাকারবারী ও ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতিহত করার জন্য এ বাহিনী সময়ের প্রয়োজনেই গঠন করা হয়েছিল এবং রক্ষীবাহিনী যথাবিধি তাদের কর্তব্য পালন করেছে। রক্ষীবাহিনী প্রচুর অস্ত্র উদ্ধার করে। বিপুল চোরাচালানকৃত পণ্য আটক করে। এ ক্ষেত্রে তাদের সফলতা ও পদক্ষেপ এতটাই আইনানুগ ও নিখুঁত ছিল যে কালোবাজারি আর অবৈধ গুদামজাতকারী রক্ষীবাহিনীর নাম শুনলে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ত। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর রক্ষী বাহিনী ভেঙে দেয়া হয়।[২৬]

মুক্তিযুদ্ধের সময় দেশের পুলিশ বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল। বঙ্গবন্ধু সরকার ক্ষমতা গ্রহণের সময় দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য উপযুক্ত নিরাপত্তা বাহিনী ছিল না। সেনাবাহিনী তখন সুসংগঠিত ছিল না। বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করার জন্য সেনাবাহিনীর সাহায্য লাভের সুযোগ ছিল না। এমনি অবস্থায় ষড়যন্ত্রকারীরা দেশে নৈরাজ্যকর অবস্থা সৃষ্টি করলে সরকার জাতীয় মিলিশিয়া বাহিনী গঠনের চিন্তাভাবনা করতে থাকে। উদ্দেশ্য ছিল এই বাহিনী পুলিশকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করবে। প্রয়োজনবোধে সেনাবাহিনীকেও সাহায্য করবে। তবে এ বাহিনী থাকবে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণে। ১৯৭২ সালের ৭ মার্চ 'জাতীয় রক্ষীবাহিনী আদেশ প্রণয়ন করা হয় (রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ২১.১৯৭২)

তবে তা ১ ফেব্রুয়ারি থেকে কার্যকর হয়। এই আইনের ১৮ অনুচ্ছেদে বলা হয় যে, 'সুনির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে এই বাহিনীকে অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলার কাজে বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করার জন্য নিয়োগ করতে পারবে। সরকার আহ্বান করলে এই বাহিনী সশস্ত্র বাহিনীকে সাহায্য করবে এবং সরকার নির্দেশিত অন্যান্য দায়িত্ব পালন করবে। আইনের ১৬নং অনুচ্ছেদে বাহিনীর পরিচালক ও অফিসারদের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন করা হয়। ১৭নং অনুচ্ছেদে সরকারকে রক্ষীবাহিনীর জন্য আইন প্রণয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ, প্রশাসন, হুকুমদান, নিয়ন্ত্রণ কিংবা শৃঙ্খলা বিধানের ক্ষমতা দেওয়া হয়। ৮নং অনুচ্ছেদে বিধান রাখা হয় যে ফৌজদারি দণ্ডবিধি বা অন্য যে কোনো আইনের পরিপন্থী না হলে রক্ষী বাহিনীর যে কোনো সদস্য বা অফিসার ৮নং অনুচ্ছেদ বলে বিনা ওয়ারেন্টে (১) যে কোনো আইনের পরিপন্থী অপরাধে লিপ্ত থাকার সন্দেহবশত যে কোনো ব্যক্তিকে গ্রেফতার (২) যে কোনো ব্যক্তি, স্থান, যানবাহন, নৌযান ইত্যাদি তল্লাশি বা আইন শৃঙ্খলা বিরোধী কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে, এমন যেকোনো সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করতে পারবেন। রক্ষী বাহিনীর অনেক কাজের মধ্যে কিছু ভুল হলে বা রক্ষী বাহিনীর কোনো সদস্য ভুল কাজ করলে তা এ বাহিনী তৈরির উদ্দেশ্যকে বা বাহিনীর সাফল্যকে ম্রিয়মান করে না। বরং এটিই সঠিক যে বঙ্গবন্ধু জনগণের জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে রক্ষী বাহিনীর মতো একটা প্যারামিলিটারি বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন।

২. বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ : ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সরকার বিশেষ ক্ষমতা আইন প্রণয়ন করেন। এই আইনে নিবর্তনমূলক আইনের বিধান রাখা হয়। অর্থাৎ সরকার যে কোনো ব্যক্তিকে ক্ষতিকর কার্য থেকে বিরত রাখার জন্য আটক রাখতে পারবে। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে যথাসম্ভব শীঘ্র গ্রেফতারের কারণ অবহিত করা ও আইনজীবীর মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার দেওয়া হয়। এই আইনের ১৫ ধারা বলে ক্ষতিকর ধ্বংসাত্মক কাজ, ১৬নং ধারা বলে ক্ষতিকর রিপোর্ট প্রকাশ, ১৭ ও ১৮ নং ধারা বলে কোনো দলিল তৈরি, মুদ্রণ বা প্রকাশনা এবং কতিপয় বিষয় প্রকাশনা থেকে যে কোনো ব্যক্তিকে বা সংবাদ মাধ্যমকে নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯ ও ২০নং ধারা বলে শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য

হুমকিস্বরূপ কোনো সংগঠনকে নিয়ন্ত্রণ করার বিধান করা হয়। ২৪নং ধারা বলে সাক্ষ্য আইন জারির ক্ষমতা ২৫নং ধারার মাধ্যমে মজুতদারি, কালোবাজারি, চোরাচালানি, ভেজাল দেয়া, মুদ্রা ও বা স্ট্যাম্প জাল করা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ ও অপরাধীকে সাজা প্রদানের বিধান করা হয়। বিশেষ ক্ষমতা আইন। সমাজ বিরোধী তৎপরতা রোধের জন্য করা হয়েছিল। এ আইন অদ্যাবধি কোনো সরকারই বাতিল করেনি বা করার উদ্যোগ গ্রহণ করেনি।

সরকার দ্বিতীয় সংশোধনী দ্বারা সংবিধানের ৩৩ অনুচ্ছেদ সংশোধন করে কোনো ব্যক্তিকে বিনা বিচারে আটক রাখার বিধান করে। মূল ৩৩ অনুচ্ছেদে বিধান ছিল গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে যথাশীঘ্র গ্রেফতারের কারণ না জানিয়ে আটক রাখা যাবে না এবং উক্ত ব্যক্তিকে তার মনোনীত আইনজীবীর মাধ্যমে আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার দিতে হবে। প্রত্যেক আটক ব্যক্তিকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে হাজির করতে হবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি ব্যতিত তাকে ২৪ ঘণ্টার বেশি আটক রাখা যাবে না। কিন্তু দ্বিতীয় সংশোধনী অনুসারে জাতীয় সংসদ ২৪ ঘণ্টার অধিককাল আটক রাখার বিধান প্রণয়নের ক্ষমতা লাভ করে। সাধারণ অবস্থায় বিধানের অধীনে কোনো ব্যক্তিকে ৬ মাস পর্যন্ত বিনা বিচারে আটক রাখার বিধান করা হয়। আর ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি উপদেষ্টা পরিষদ যদি ৬ মাস অতিবাহিত হওয়ার আগে আটককৃত ব্যক্তির বক্তব্য শোনার পর তাকে আরও অধিককাল আটক রাখা আবশ্যক মনে করে দ্বিতীয় সংশোধনীতে তাকে আটক রাখা বৈধ করা হয়। সংশোধনীতে সুপ্রিম কোর্টের বিচারক রয়েছেন বা ছিলেন বা সুপ্রিম কোর্টের বিচারক পদে নিয়োগ লাভের যোগ্যতা রাখেন এমন দুজন এবং প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত একজন প্রবীণ কর্মকর্তা নিয়ে উল্লিখিত উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের বিধান রাখা হয়।

অনুচ্ছেদ (৪) নিবর্তনমূলক আইনের অধীনে কোনো ব্যক্তিকে আটক করা হলে উক্ত আটকের পর আদেশ দানকারী কর্তৃপক্ষ তাকে যথাসম্ভব শীঘ্র আটকের কারণ অবহিত করবেন এবং উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে বক্তব্য

প্রদানের জন্য তাকে যথাসম্ভব দ্রুত সুযোগ দান করবেন। দেশ তাকে আমদানিকারী কর্তৃপক্ষের বিবেচনায় তথ্যাদি প্রকাশ জনস্বার্থ বিরোধী হলে কর্তৃপক্ষ তা প্রকাশ না করার ক্ষমতাও এ সংশোধনীর মাধ্যমে লাভ করেন।

বাংলাদেশে এই আইনটি বিশেষ ক্ষমতা আইন হিসেবে খ্যাত এবং সব বিরোধী দল সবসময় এ আইনটির কড়া সমালোচক। কিন্তু সমালোচক প্রত্যেক বিরোধী দলই ক্ষমতাসীন হওয়ার পর এ আইন প্রত্যাহারের বা বাদ দেয়ার উদ্যোগ নেয়নি। তাহলে ধরে নেয়া যায় এটিও সমালোচনার জন্য সমালোচনা। প্রকৃত বিষয় হচ্ছে ১৯৭৩-৭৪ সালের বাস্তবতায় এ ধরনের একটি আইন প্রয়োজন ছিল। বঙ্গবন্ধু এই আইনটি করেছিলেন অবৈধ মজুতদার, চোরাকারবারী, ভেজালদাতা, মুদ্রা ও স্ট্যাম্প জালকরীকে তাৎক্ষণিক শাস্তি বিধানের জন্য। কারণ প্রচলিত আইনের ফাঁক ফোকর গলে তারা বেরিয়ে যাচ্ছিল এবং এভাবে সদ্য স্বাধীন দেশটিতে নানাবিধ অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতা তৈরি করছিল। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন করা বঙ্গবন্ধুর উদ্দেশ্য ছিলনা। অথচ পরবর্তী সরকারগুলো এর সঠিক ব্যবহার না করে অপব্যবহার করেছে।

বাকশাল গঠন : ২৫ জানুয়ারি ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিব সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে দেশে একটি জাতীয় দল গঠনের বিধান করেন। তিনি ১৯৭৫ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) নামে একটি একক জাতীয় দল গঠনের কথা ঘোষণা করেন। তিনি এর চেয়ারম্যান এবং বিলুপ্ত আওয়ামী লীগ দলীয় সকল সংসদ সদস্য ও সকল মন্ত্রী এর সদস্য বলে গণ্য হয়। রাষ্ট্রপতি ১৯৭৫ সালের ৬ জুন বাকশালের গঠনতন্ত্র ঘোষণা করেন। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী জাতীয় দলের ১৫ সদস্যবিশিষ্ট কার্যনিবাহী কমিটি এবং ১১৫ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যগণের নামও ঘোষণা করা হয়।[২৭] বঙ্গবন্ধু কার্যনির্বাহী কমিটি ও কেন্দ্রীয় কমিটি উভয়েরই সভাপতি এবং ক্যাপ্টেন মনসুর আলী দলের সেক্রেটারি জেনারেল মনোনীত হন। কেন্দ্রীয় কমিটিতে উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, সশস্ত্রবাহিনীর তিন

প্রধান, তিনজন উপাচার্য, তিনজন সংবাদ সম্পাদক, রক্ষী বাহিনীর প্রধান, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর, চিকিৎসক, সংসদ সদস্য অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। গণতন্ত্র অনুসারে বাকশালের ৫টি অঙ্গ সংগঠন ছিল।

১. জাতীয় কৃষক লীগ

২. জাতীয় শ্রমিক লীগ

৩. জাতীয় মহিলা লীগ ৪. জাতীয় যুবলীগ ও

৫. জাতীয় ছাত্রলীগ। চেয়ারম্যানকে অন্যান্য অঙ্গসংগঠন ও সংস্থা ইত্যাদি গঠন করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়।

এসব অঙ্গসংগঠন ও কার্যনির্বাহী কমিটির প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে কাজ করবে মর্মে স্থির হয়। ১৯৭৫ সালের ১৯ জুন বাকশাল কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সভায় রাষ্ট্রপতি এক নতুন শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করার কথা ঘোষণা করেন। এই নতুন ব্যবস্থায় বাংলাদেশের মহকুমাগুলোকে জেলায় রূপান্তর করে ৬০টি নতুন জেলা গঠন করে প্রতিটি জেলায় একজন গভর্নর নিয়োগের ও এক একটি প্রশাসনিক পরিষদ গঠনের বিধান করা হয়। জেলা গভর্নর হবেন পরিষদের প্রধান। এ ব্যবস্থা ১৯৭৫ সালের ১ সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হওয়ার কথা ছিল। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার কারণে বাকশাল কর্মসূচি কার্যকর হতে পারেনি। তাই এর ভালো মন্দ মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। তবে বাকশাল প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার পক্ষে বঙ্গবন্ধু যে যুক্তি উপস্থাপন করেন তা এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা যেতে পারে। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি জাতীয় সংসদে সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী গ্রহণের প্রাক্কালে প্রদত্ত ভাষণে বঙ্গবন্ধু দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন যে, দেশের অর্থনৈতিক মুক্তি, শোষণহীন সমাজব্যবস্থা এবং শোষিতের সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মহৎ লক্ষ্যেই সংবিধানে সংশোধনী আনা অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। তিনি বলেন, বর্তমানে যে নৈরাজ্যকর অবস্থা চলছে তা আর চলতে দেয়া যায় না। তিনি সংসদকে লক্ষ করে বলেন,

প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সকল নির্বাহী ও প্রশাসনিক ক্ষমতা তার নিজের হাতে কেন্দ্রীভূত থাকা সত্ত্বেও জনগণের জানমালের পূর্ণ নিরাপত্তা ও সকল শোষণ অবিচার নির্যাতন দূরীকরণের অপরিহার্য প্রয়োজনেই সংবিধানে মৌলিক পরিবর্তন আনা অবশ্যম্ভভাবী হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু দ্বিতীয় বিপ্লবের মাধ্যমে দেশের মানুষের ওপরে সামগ্রিক শোষণ অপসারণের দৃঢ়প্রত্যয় ঘোষণা করবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। সারাজীবন তিনি এর জন্য সংগ্রাম করেছেন। স্বাধীনতার পর সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তনের জন্য তিনি স্বেচ্ছায় রাষ্ট্রপতির পদ থেকে পদত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার কয়েক বৎসরের মধ্যে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক সংকটের কারণে তিনি বহুদলীয় ব্যবস্থা রহিত করে এক দলীয় শাসন বাকশাল কায়েম করেছেন। বস্তুত বাকশাল সে অর্থে কোনো রাজনৈতিক আদর্শ ছিল না। এটি নিশ্চিত করার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পরীক্ষামূলকভাবে প্রবর্তন করেছিলেন। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ এর সুফল ভোগ করার আগেই পুজিবাদী, সাম্রাজ্যবাদের দোসর বাংলাদেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির বিরুদ্ধ পক্ষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করে তার দ্বিতীয় বিপ্লব কর্মসূচির বিলোপ সাধন করে।

৪. ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ[২৮] : বঙ্গবন্ধু সরকারকে আরেকটি সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয় ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ নিয়ে। উক্ত দুর্ভিক্ষের জন্য উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত খাদ্য ঘাটতি, মুক্তিযুদ্ধের সময় সৃষ্ট খাদ্য ঘাটতি, ১৯৭২-৭৪ সময়ের খরা, বন্যা, দেশি বিদেশি চক্রান্ত কতটা দায়ী তা বিবেচনায় না নিয়ে একতরফাভাবে বঙ্গবন্ধু সরকারকে দায়ী করে অপপ্রচার চালানোর একটি প্রবণতা চলে আসছিল। পাকিস্তান আমলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি খাদ্য ঘাটতি অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। খাদ্য ঘাটতি ১৯৫০ সালে ৫ লক্ষ টন থেকে বেড়ে ষাটের দশকের শেষের দিকে প্রায় ১৫ লক্ষ টনে উন্নীত হয়। ১৯৬৮, ১৯৬৯ এবং ১৯৭০ সালে বাংলাদেশে যে ভয়াবহ বন্যা হয়। তার ফলে ১৯৭০ সালে খাদ্য ঘাটতির

পরিমাণ ২২ লাখ টনে পৌঁছায়। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় কৃষিকাজ ব্যাহত হওয়া ও বন্যায় ১৪ হাজার বর্গমাইল এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হলে খাদ্য ঘাটতি কমপক্ষে ৪০ লক্ষ টনে দাঁড়ায়। এমতাবস্থায় ১৯৭২ সালের খরায় আউশ ধানের ব্যাপক ক্ষতিসাধন হয়। ১৯৭৩ সালের ডিসেম্বরে বরিশাল, পটুয়াখালী ও খুলনায় ব্যাপক জলোচ্ছ্বাসে মাঠের ফসল নষ্ট হয়ে যায়। এরপর ১৯৭৪ সালে দুইবার বন্যা হয়। এপ্রিল মাসে সিলেটে এবং জুলাই-আগস্ট মাসে সারাদেশে প্রায় ১ কোটিটন ফসল নষ্ট হয়ে যায়। ফলে ১৯৭৪ সালে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। সে সময় আন্তর্জাতিকভাবে যথেষ্ট পরিমাণ খাদ্য সাহায্য পাওয়া যায়নি। উপরন্তু চোরাচালান খাদ্য সঙ্কট ভয়াবহ করে তোলে। ১৯৭৪ সালের মাঝামাঝি থেকে পরিস্থিতি খারাপ হতে থাকে। জুন মাসে যেখানে প্রতি সের মোটা চালের মূল্য ৩.৯০ টাকা আগস্ট মাসে তা হয় ৪.৭৮ টাকা। সেপ্টেম্বরে ৬ টাকা এবং অক্টোবর মাসে ৭.১৬ টাকায় উন্নীত হয়। সরকার পরিস্থিতিকে মোকাবিলা করার জন্য সারাদেশে ৫৭০০টি লঙ্গরখানা চালু করেছিল। কিন্তু এতদ্‌সত্ত্বেও উক্ত দুর্ভিক্ষে সরকারি হিসেব মতে ২৭,৫০০ জন লোকের মৃত্যু ঘটেছিল। বেসরকারি হিসাব মতে তা তিনগুণের বেশি ছিল। ১৯৭৪ সালের নভেম্বর মাসের মধ্যেই পরিস্থিতি অনুকূলে আসে।

১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ শেখ মুজিবুরের বিরুদ্ধে একটি জোড়ালো অভিযোগ ছিল। তাঁর অব্যবস্থাপনা ও অদক্ষতায় এমনটি হয়েছিল সমালোচকগণ এমনই মনে করেন। অথচ ১৯৭১ সালের আগে গণঅভ্যুত্থান ও নির্বাচন এবং বন্যা এরপর ৯ মাস টানা যুদ্ধে বাংলাদেশে কী পরিমাণ খাদ্য ঘাটতি ছিল, উৎপাদন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে কী অবস্থা তৈরি হয়েছিল বীজ, সার, কীটনাশক, জল সেচের কী ভয়ানক অবস্থা করে রেখেছিল পাক সরকার সে বিষয়ে সমালোচকগণ কোনো কথাই বলেন না। বস্তুত উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত খাদ্য ঘাটতি, কৃষির ভয়ানক দৈন্যদশা এবং বৈরী প্রকৃতির কারণে বাংলাদেশে একটি দীর্ঘস্থায়ী ভয়ানক দুর্ভিক্ষ অবশ্যম্ভাবী ছিল।

৫. ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তি[২৯] : ১৯৭২ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের অবদানের কথা অস্বীকার করার উপায় নেই। ভারত বাংলাদেশ যৌথ বাহিনী সম্মিলিত আক্রমণের কাছেই পাকিস্তান বাহিনী পরাজিত হয়ে আত্মসমর্পণ করে। সেই ভারতীয় বাহিনীকে ১৯৭২ সালের ১২ মার্চ বাংলাদেশ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রত্যাহার করা হয়। এটি বঙ্গবন্ধুর বড় কৃতিত্ব। এরপর ১৭ মার্চ (১৯৭২) ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশ সফরে আসেন। এ সময়ে (১৯ মার্চ) তিনি এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নবায়ণযোগ্য একটি ২৫ বছর মেয়াদি মৈত্রী সহযোগিতা ও শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এর মাধ্যমে বন্ধুত্ব, রক্ত ও আত্মদানের মধ্য দিয়ে দুদেশের গড়ে ওঠা সম্পর্ক আনুষ্ঠানিক ভিত্তি অর্জন করেছিল। চুক্তিতে ১০টি মৌলিক উদ্দেশ্য ও ১২টি অনুচ্ছেদ ছিল। চুক্তির ভিত্তি ছিল উভয় দেশের সাধারণ আদর্শ যথা শান্তি, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও জাতীয়তাবাদ। চুক্তির প্রস্তাবনায় সম্ভাব্য সকল রকমের পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে উভয় দেশের সীমান্তকে চিরন্তন শান্তি ও বন্ধুত্বের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। চুক্তির শর্তগুলো ছিল নিম্নরূপ :

১. উভয় দেশ নিজ নিজ স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা বজায় রেখে একে অপরের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকবে।

২. উভয় পক্ষ সারাবিশ্বের উপনিবেশবাদ ও বর্ণবৈষম্যবাদ বিরোধী ও জাতীয় মুক্তির জন্য সংগ্রামরত জনসমষ্টির সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে তাদের সর্বতোভাবে সমর্থন প্রদান করবে।

৩. উভয় পক্ষ তাদের জোটনিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিতে অটল থাকবে।

৪. যে কোনো আন্তর্জাতিক সমস্যায় উভয় পক্ষের স্বার্থে তারা পরস্পরের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ ও মতবিনিময় করবেন।

৫. উভয় পক্ষ প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক কারিগরি ক্ষেত্রে এ দু দেশের মধ্যে বাণিজ্য, পরিবহন ও যোগাযোগ ক্ষেত্রে যোগাযোগ বৃদ্ধি করবে এবং পরস্পরের স্বার্থ রক্ষা করবে।

৬. বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী সমতল উন্নয়ন, জলবিদ্যুৎ, বিদ্যুৎ ও সেচ ব্যবস্থা উন্নয়নে যৌথ সমীক্ষা চালাবে :

৭. উভয়পক্ষ সাহিত্য, শিল্পকলা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি, ক্রীড়া ও স্বাস্থ্য বিষয়ে সম্পর্ক অব্যাহতভাবে ভালো রাখবে :

৮. কোনো একপক্ষ অপরপক্ষের সঙ্গে বিবাদরত কোনো শক্তির সাথে সামরিক মৈত্রী স্থাপনের থেকে বিরত থাকবেন, একে অপরের ওপর কোনো আগ্রাসনমূলক তৎপরতা পরিচালনা করবে না এবং নিজ ভূখণ্ডে এমন কোনো সামরিক আয়োজনে ব্যস্ত থাকবে না যা আরেক পক্ষ দ্বারা আক্রান্ত হলে বা আক্রান্ত হবার হুমকির সম্মুখীন হলে উভয়পক্ষ তাৎক্ষণিকভাবে পারস্পরিক মতবিনিময়ের জন্য আলোচনায় বসে তাদের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সেই আক্রমণ বা হুমকি নিরসনে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন :

১০. কোনো পক্ষ এই চুক্তির পরিপন্থী হয় এমন কোনো বিষয়ে কোনো এক বা একাধিক দেশের সঙ্গে প্রকাশ্যে বা গোপনে যে কোনো রকমের প্রতিশ্রুতি প্রদান থেকে বিরত থাকবে।

আলোচ্য চুক্তিকে বঙ্গবন্ধুর সমালোচগণ গোলামির চুক্তি বলে সমালোচনা করেন। কিন্তু চুক্তির ধারাগুলো পর্যালোচনা করলেই দেখা যাবে যে বঙ্গবন্ধু ঐ চুক্তির মাধ্যমে বাংলাদেশের মর্যাদা সামান্যতমও ক্ষুন্ন করেননি। চুক্তিটি 'গোলামির' হয়ে থাকলে ১৯৭২-১৯৯৬ সময় কালে যারা ক্ষমতায় ছিলেন তারা তা বাতিল করতে পারতেন।

৬. **সামরিক-বেসামরিক আমলাদের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব :** সামরিক ও বেসামরিক আমলাদের মধ্যে দলাদলি, মুজিব নগরীয় ও অমুজিবনগরীয় আমলা ও কর্মচারিদের মধ্যে মন কষাকষি ও কোন্দল বৃদ্ধি পায়। যারা পাকিস্তানে আটকা পড়েছিলেন তারা কোলাবরেটর (Collaborator) এবং

যারা ভারতে গিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেন তারা দেশপ্রেমিক (Patriot) বলে আখ্যায়িত হন। আওয়ামী লীগ সরকার দেশপ্রেমিকদেরই প্রাধান্য দেন। ফলে তাদের মধ্যে মন কষাকষির সৃষ্টি হয়।

শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতিকে কেবল একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রই উপহার দেননি। তিনি মাত্র তিন বছর সময়কালের মধ্যে যুদ্ধবিধ্বস্ত পোড়ামাটির এক সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রের, শত সমস্যা জয় করে তাকে শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করান। বাংলাদেশের নিরঙ্কুশ সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি সর্বপ্রথম বাংলাদেশ থেকে ভারতীয় সৈন্য ফেরত পাঠান। মাত্র তিন মাসের মধ্যে মিত্রবাহিনী প্রত্যাহার ছিল ইতিহাসে বিরল। তিনি প্রশাসনিক ব্যবস্থা পুনর্গঠন করেন, দেশকে স্বাভাবিক করেন, সংবিধান প্রণয়ন করেন। এক কোটি শরণার্থীকে পুনর্বাসিন করেন, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও সকল অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন করেন, শিক্ষা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ ঘটান, মদ, জুয়া ঘোড়া দৌড়সহ সমস্ত ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ড কার্যকরভাবে নিষিদ্ধ করেন, নারী পুনর্বাসন সংস্থা গঠন করেন, মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট গঠন ও বীর মুক্তিযোদ্ধাদের বিভিন্ন খেতাবে ভূষিত করেন। কৃষির উন্নতি ঘটান, শিল্পকলকারখানা, ব্যাংক-বীমা, জাতীয়করণ করে সচল করার মাধ্যমে হাজার হাজার শ্রমিক কর্মচারির কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেন। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে দৃঢ় করেন, ১২১টি দেশের স্বীকৃতি অর্জন করেন।

বাংলাদেশকে জাতিসংঘ, কমনওয়েলথ, জোটনিরপেক্ষ ও ইসলামি ব্লকের সদস্য করার মাধ্যমে পররাষ্ট্রনীতিতে সফলতা অর্জন করেন এবং এভাবে বাংলাদেশকে বিশ্বের দরবারে একটি মর্যাদাশীল দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর কৃতিত্বের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে ১৯৭২ সালের জুন মাসে লন্ডনের 'সানডে টাইমস' পত্রিকায় মন্তব্য করেন যে, পরিস্থিতি তিনি যেভাবে আয়ত্তে এনেছেন, তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। এ ব্যাপারে সকল বিদেশির তিনি প্রশংসা কুড়িয়েছেন। এটা সত্যই একটা অলৌকিক ঘটনা যে, স্বাধীনতার পর অন্তত পাঁচ লাখ লোকও নিহত হলো না। এখন পর্যন্ত কেউ অনাহারে মারা যায়নি এবং সরকার দিব্যি কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

এসব কিছুই বঙ্গবন্ধুর জন্য সম্ভব হয়েছে। সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন বঙ্গবন্ধু দেখেছিলেন আমরা যদি নিষ্ঠার সাথে কাজ করি দলীয় স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে দেশের স্বার্থ সবকিছুর উর্ধ্বে স্থান দেই্ তাহলে বঙ্গবন্ধুর সে স্বপ্ন বাস্তবায়ন সম্ভব।

৭. প্রবৃত্তি ও সুযোগ : এস. ই ফাইনারের মতে, সামরিক অভ্যুত্থানের পিছনে দুটি উপাদান কাজ করে। (ক) ক্ষমতা দখলের প্রবৃত্তি (খ) ক্ষমতা দখলের সুযোগ। ১৫ আগস্ট অভ্যুত্থানের পিছনে সেনাবাহিনীর ক্ষমতা দখলের প্রবৃত্তি ও সুযোগ পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল।

ক. প্রবৃত্তি : আগস্ট অভ্যুত্থানের অন্যতম নায়ক লে. কর্ণেল ফারুক রহমান বলেন, তাহারা নিম্নোক্ত কারণে শেখ মুজিবকে হত্যা করিয়া ক্ষমতা দখল করেন :

১. আওয়ামী লীগের লোকেরা একজন সামরিক অফিসারের স্ত্রীর শ্লীলতাহানি করে কিন্তু শেখ মুজিব তাহার বিচার করেন নাই।

২. ব্যক্তিগত লোভে মুজিব গণতন্ত্রকে হত্যা করিয়া গোটা জাতিকে শৃঙ্খলিত করেন।

৩. মুজিব, তাঁহার পরিবার, তাঁহার দল এবং দুর্নীতিবাজ আমলারা দেশের সম্পদ লুণ্ঠন করেন, অপরদিকে সাধারণ মানুষ অনাহারে মৃত্যুবরণ করে।

৪. তাঁহার সরকার দেশকে বিদেশি শক্তির হাতে তুলিয়া দেন।

৫. মুজিব ইসলাম ধর্মের সহিত বিশ্বাসঘাতকতা করেন।

৬. তিনি সশস্ত্র বাহিনীকে দারুণভাবে অবহেলা ও অপমানিত করেন।

উপর্যুক্ত বক্তব্য হতে প্রতীয়মান হয় যে অভ্যুত্থানের নেতাদের কিছু ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত ক্ষোভ ছিল এবং তারা মুজিব সরকারের রাজনৈতিক

আদর্শ ও নীতি বিরোধী ছিলেন। সেই কারণে তারা রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করেন। তাদের ক্ষোভের প্রধান কারণগুলো ছিল নিম্নরূপ :

১. একজন সামরিক অফিসারের স্ত্রীর প্রতি একজন আওয়ামী লীগ নেতা দুর্ব্যবহার করেন। সামরিক বাহিনীর লোকেরা মনে করেন যে সরকার এর সুবিচার করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই তারা ক্ষুব্ধ হয়।

২. ১৯৭৩ এবং ১৯৭৪ সালে বেআইনি অস্ত্র উদ্ধার ও সমাজবিরোধী কার্যকলাপ দমনের উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনীকে তলব করা হয়। এর ফলে যেমন সরকারের দুর্বলতা প্রকাশ পায় তেমনি সেনাবাহিনীর সদস্যরা দারুণভাবে ক্ষুব্ধ হন। কারণ ১৯৭৪ সালে যখন তারা তাদের দায়িত্ব পালন করেছিলেন তখন মধ্য পথে তাদের প্রত্যাহার করা হয়। এমনকি অভিযানে বাড়াবাড়ির অভিযোগে কয়েকজন সামরিক অফিসারকে বরখাস্ত করা হয়।

৩. পাকিস্তান আমলে বাঙালি জাতীয়তাবাদী এলিটগণ সামরিক আমলাতান্ত্রিক আধিপত্য ও নিপীড়নের শিকার হন। ফলে বাংলাদেশের নতুন শাসকবৃন্দ সামরিক প্রভাব দূরীভূত করে রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার কৌশল অবলম্বন করেন। সুতরাং তারা একটি শক্তিশালী ও বৃহৎ সেনাবাহিনী গড়ে তোলার পক্ষপাতী ছিলেন না। যেখানে পাকিস্তানে রাজস্ব ব্যয়ের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ করা হতো সেখানে বাংলাদেশ ১৯৭২-৭৩ সালে বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ ছিল মাত্র ১৮.৩%। এই বরাদ্দ ১৯৭৫-৭৬ সালের বাজেটে ১২.৫% ভাগে হ্রাস পায়। অপরদিকে ১৯৭২ সালে জাতীয় রক্ষী বাহিনী নামে একটি আধা সামরিক বাহিনী সৃষ্টি করা হয় যা তুলনামূলকভাবে দ্রুত সম্প্রসারিত হতে থাকে। প্রতিরক্ষা খাতে স্বল্প ব্যয় বরাদ্দের কারণে সামরিক বাহিনীর বস্তুগত সুযোগ সুবিধা ও সম্প্রসারণ বাধাপ্রাপ্ত হয়। অন্যদিকে জাতীয় রক্ষীবাহিনী সামরিক বাহিনীর পেশাগত গর্ব ও প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদার প্রতি হুমকি হিসাবে প্রতীয়মান হয়।

৪. পাকিস্তান প্রত্যাগত সামরিক বাহিনীর সদস্যগণ (বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যাদের সংখ্যা ছিল অর্ধেকের বেশি) সরকারের প্রতি ক্ষুব্ধ ছিলেন। কারণ তারা যে আঠারো মাস পাকিস্তানে আটক ছিলেন সরকার তার বেতন দেয়নি। তাছাড়া মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অনেক জুনিয়র অফিসারকে দ্রুত পদোন্নতি দেয়ার ফলে পাকিস্তান প্রত্যাগত অনেক অফিসার তাদের সিনিয়রিটি হারান।

৫. সামরিক বাহিনীর অনেকে আওয়ামী লীগ সরকারের পররাষ্ট্রনীতির বিরোধী ছিলেন। পাকিস্তান বাহিনীর সদস্য হিসাবে তাদের মধ্যে ভারত বিরোধী মনোভাব দৃঢ়মূল ছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে একত্রে লড়াই করলেও তাদের এ মনোভাব দূরীভূত হয়নি। যুদ্ধের পর ভারতীয় বাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশ হতে সামরিক সাজসরঞ্জাম স্থানান্তর এই মনোভাবকে বদ্ধমূল করতে সাহায্য করে। আওয়ামী লীগের ভারত ঘেঁষা পররাষ্ট্রনীতির কারণে ভারতবিরোধী মনোভাব, মুজিববিরোধী মনোভাবে রূপান্তরিত হয়। ভারত বাংলাদেশ মৈত্রীকে অনেকেই বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী বলে মনে করে এবং তারা মুজিবকে অপসারণ করে ভারতের আধিপত্য হতে দেশকে মুক্ত করতে চায়।

৬. বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর একটি অংশ পাকিস্তান বাহিনীর উত্তরাধিকারী হিসেবে রক্ষণশীল ইসলামি আদর্শের অনুসারী ছিল। তাদের প্রত্যাশা ছিল জাতীয় জীবনে ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে। কিন্তু আওয়ামী লীগ কর্তৃক ধর্মনিরপেক্ষতাকে অন্যতম রাষ্ট্রীয় আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করাকে তারা ইসলামের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলে মনে করে।

খ. সুযোগ : অপরদিকে নিম্নোক্ত কারণে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতি জনগণের আনুগত্যের অভাব ঘটে এবং সামরিক হস্তক্ষেপের জন্য ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হয়।

১. বহুদলীয় সংসদীয় গণতন্ত্র সম্পর্কে দেশে একটি সাধারণ ঐকমত্য ছিল। কিন্তু ১৯৭৫ সালে একদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে এই

ঐকমত্য নষ্ট হয়ে যায়। একদলীয় ব্যবস্থায় রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সুযোগ দারুণভাবে বিঘ্নিত হয়। অনেকেই এই ব্যবস্থাকে অবৈধ বলে মনে করেন এবং অধিকাংশ রাজনৈতিক দল মুজিব সরকারকে উৎখাতের জন্য সহিংস পন্থা অবলম্বন করে। এমনকি আওয়ামী লীগের একটি অংশ একদলীয় ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণ করে।

২. আওয়ামী লীগ শাসনামলে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, মজুতদারি, কালো বাজারি, চোরাকারবারি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও প্রশাসনিক অদক্ষতার কারণে দেশের অর্থনীতিতে নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়। কৃষি ও শিল্প খাতে উৎপাদন হ্রাস ও বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতির ফলে জীবনযাত্রার ব্যয় দ্রুত বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৯-৭০ সালে ব্যয়ের সূচক ১০০ ধরে ১৯৭১-৭২ সালে মধ্যবিত্ত শ্রেণির জীবনযাত্রার ব্যয় ছিল ১২১। ১৯৭৪-৭৫ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৪০০-এ দাঁড়ায়। সকল শ্রেণীর মানুষের প্রকৃত আয় কমে যায় এবং ১৯৭৪ সালের শেষার্ধে সরকারি হিসেবে ২৭,৫০০ লোক দুর্ভিক্ষে মারা যায়।

৩. আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির দারুণ অবনতি ঘটে। ১৯৭০ সালের তুলনায় ১৯৭৪ সালে অপরাধের সংখ্যা ৯২% বৃদ্ধি পায়। রাজনৈতিক হত্যা, সশস্ত্র ডাকাতি এবং ব্যাংক বাজার ও পুলিশ ফাঁড়ি লুট নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়। এইসব কারণে মুজিব সরকারের প্রতি জনসমর্থন ব্যাপক হ্রাস পায় যা সেনাবাহিনীকে হস্তক্ষেপের জন্য উৎসাহিত করে।

৪. আওয়ামী লীগ দল আদর্শগত দ্বন্দ্ব ও ব্যক্তিগত কোন্দলের কারণে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং এই অবনতিশীল অবস্থার মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়। সরকার বেসামরিক আমলাদের সক্রিয় সহযোগিতা লাভেও ব্যর্থ হয়। মুজিব শাসনামলে উচ্চ পর্যায়ের আমলাদের বেতন হ্রাস করা হয় এবং হাজার হাজার কর্মচারিকে চাকরিচ্যুত করা হয়।

এভাবে মুজিব সরকার অভ্যন্তরীণভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সেই সুযোগে কিছুসংখ্যক সামরিক বাহিনীর অফিসার সহজেই ক্ষমতা দখল করতে সমর্থ হন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তিনজন বরখাস্তকৃত সামরিক অফিসারসহ ২০-৩০জন মেজর ও ক্যাপ্টেন সাজোয়া বাহিনীর প্রায় ১৪০০ সৈন্যের সমর্থনে ১৫ আগস্ট সামরিক অভ্যুত্থান ঘটান। মনে করা হয় এই অভ্যুত্থান পরিকল্পনায় খন্দকার মোশতাক আহমদ সহ কতিপয় আওয়ামী লীগ নেতা জড়িত ছিলেন।[৩১]

১.৪.২. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকারের ব্যর্থতা

বাঙালি জাতি অনেক আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে পাকিস্তান শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতা পরবর্তীতে শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধবিধস্ত একটি দেশের হাল ধরতে গিয়ে দেশি বিদেশি চক্রান্তকারীদের এবং তার দলের মধ্যেই লুকিয়ে থাকা সাম্রাজ্যবাদী চরদের ষড়যন্ত্রের শিকার হন। প্রাকৃতিক দুযোর্গ এবং তার নিজ দলের একাংশের দুর্নীতিও তাকে পদে পদে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দিয়েছিল। তবুও মাত্র সাড়ে তিন বছরের শাসনকার্যের কিছু কিছু অভাবনীয় সাফল্যের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। এগুলো হলো :

১. সংবিধান প্রণয়ন

২. ভারতীয় সৈন্যদের দেশে পাঠান

৩. অস্ত্র উদ্ধারের ব্যবস্থাকরণ

৪. যোগাযোগ ব্যবস্থার পুনর্গঠন

৫. প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন

৬. বাংলাদেশী মুদ্রার প্রচলন

৭. জাতীয়করণ নীতি প্রবর্তন

৮. সাম্প্রদায়িক রাজনীতির অবসান

৯. বৈদেশিক সাহায্য সংস্থা

১০. জোটনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ

১১. জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠান

১২. শিক্ষা সংস্কার

১৩. ভূমি সংস্কার

১৪. প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ

১৫. আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সাফল্য ইত্যাদি।

স্বাধীনতা পরবর্তীতে একটি যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে পুনগঠন ও আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক অবদান রাখা সত্ত্বেও কতিপয় ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকারের ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয়। এসবের মধ্যে অন্যতম ছিল। ১. বিশেষ ক্ষমতা আইন ২. রক্ষীবাহনী গঠন ৩. ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ ৪. বাকশাল গঠন ৫. ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তি ১৯৭২.। এছাড়া আরো যেসব কারণ ছিল তা নিম্নরূপ :

১. আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি : বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ শাসনামলে বাংলাদেশে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির চরম অবনতি ঘটে। এ সময়ে হত্যা, লুট, রাহাজানি, ছিনতাই ইত্যাদি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। সরকারের হিসেব মতো ১৯৭২-১৯৭৫ সালের জুন মাস পর্যন্ত ২০৩৫টি গুপ্ত হত্যা, ৩৩৭টি ছিনতাই, ১৯০ টি ধর্ষণ, ৪০০৭টি ডাকাতি এবং ৬৯২ জন দুষ্কৃতকারীর হাতে নিহত হয়। কোনো কোনো সমালোচকের মতে এই সংখ্যা আরও বহুগুণ বেশি।

২. লুটপাট : পাকিস্তানি হানাদাররা লুটপাট করেছে, এরপর আসে মুক্তিযোদ্ধা নামধারী একদল লোক। সাতচল্লিশের পরেও এরকম ঘটনা ঘটেছিল। হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা হয়েছিল। বিশেষ তৎপরতা দেখা দিয়েছিল সংখ্যা লঘুর সম্পত্তি দখল করার ব্যাপারে।

৩. দুর্নীতি স্বজনপ্রীতি : আওয়ামী লীগ শানসনামলে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি চরম আকার ধারণ করে। আওয়ামী লীগ দলীয় নেতাকর্মীরা মাত্রাতিরিক্ত দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ক্ষমতাসীন সরকারের দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি জনমনে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি করে। ডেইলি এক্সপ্রেস লিখেছে শেখ মুজিবুর রহমানের পতনের ফলে এশিয়ার দুর্নীতির সবচেয়ে বড় ঘাঁটির পতন হয়েছে।

৪. সীমান্ত পাচার : বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ শাসনামলে পাট, বৈদেশিক সাহায্য, ত্রাণ সামগ্রী, খাদ্যশস্য প্রভৃতি সীমান্ত পথে অবৈধভাবে ভারতে পাচার হতে থাকে। এরূপ পাচারের ফলে দ্রব্য মূল্যের উর্ধ্ব গতি ও মুদ্রাস্ফীতি দেখা যায়।

৫. অস্ত্র উদ্ধারে ব্যর্থতা : শেখ মুজিব সরকার সকল মুক্তিযোদ্ধার নিকট থেকে অস্ত্র উদ্ধার করতে পারেনি। তাছাড়া উগ্র বামপন্থি দলগুলো জাসদ গণবাহিনী তাদের অস্ত্রশস্ত্র জমা দেয়নি। বরং এসব শক্তিসমূহ পুলিশ ফাঁড়ি আক্রমণ করে অস্ত্র শস্ত্র নিজেদের হস্তগত করতে থাকে। এসব অস্ত্রশস্ত্র অনেকে ব্যক্তিগত আক্রোশবশত এবং অনেকেই ডাকাতির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে থাকে। এর ফলে জনমনে হতাশা, আতঙ্ক, অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয় এবং আওয়ামী লীগবিরোধী মনোভাব বৃদ্ধি পায়।

৬. প্রশাসনিক ব্যর্থতা : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলে প্রশাসনিক ব্যর্থতাও ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। তার প্রশাসনিক নীতি পদক্ষেপসমূহ সামরিক বেসামরিক আমলা ব্যবস্থাকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। এ ক্ষেত্রে কয়েকটি দিক হলো :

ক. প্রশাসনিক ও চাকরি কমিটির সুপারিশ : প্রশাসনিক ও চাকরি কমিটির সুপারিশে বলা হয় যে, চাকরির ক্ষেত্রে সব ধরনের বৈষম্য হ্রাস করে একটি শ্রেণিহীন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হবে। এতে কোনো এলিট শ্রেণি থাকবে না। স্বাভাবিকভাবেই আমলারা তা সহজে মেনে নিতে পারেনি।

খ. সংবিধানে আমলাদের সাংবিধানিক পদের নিশ্চয়তা না থাকা : ১৯৭২ সালের বাংলাদেশ সংবিধানে আমলাদের চাকরি ও সুযোগ সুবিধা

সম্পর্কে কোনো প্রকার সাংবিধানিক নিশ্চয়তা ছিল না। ফলে আমলাগণ নিজেদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়ে।

গ. চাকরির ও বেতন কমিশনের সুপারিশমালা : ১৯৭২ সাল পর্যন্ত চাকরির ক্ষেত্রে ২০টি গ্রেড প্রচলিত ছিল। কিন্তু চাকরি ও বেতন কমিশন তা কমিয়ে মাত্র ১০টি গ্রেড করার সুপারিশ করে। কমিশনের এ সুপারিশ সাধারণ কর্মচারীদের সন্তুষ্ট করতে পারেনি। তাছাড়া এ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সরকারি কর্মকর্তা কর্মচারিরা যে পরিমাণ বেতন পেতেন তাও ছিল অপর্যাপ্ত।

ঘ. আমলাদের চাকুরিচ্যুত : আওয়ামী লীগ আমলে রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৮ ও ৯ এর মাধ্যমে বহু সরকারি কর্মচারিকে বরখাস্ত করা হয়। সরকারি হিসেব অনুযায়ী ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে ৯১ জন ১৯৭৪ সালে ৩০০ জন আমলা চাকরিচ্যুত হন।

ঙ. অতীতে যেসকল ক্ষেত্রে প্রশাসনিক কর্মকর্তা নিযুক্ত হতেন আওয়ামী লীগ সরকার সেসব ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের কর্মীদের নিয়োগদান করেও সরকারি কর্মচারিদের মধ্যে অনিশ্চয়তার ভাব সৃষ্টি করেন।

৭. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যর্থতা : বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলে অর্থনৈতিক ব্যর্থতাও ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়। বঙ্গবন্ধুর শাসনামলে অর্থনৈতিক ব্যর্থতার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো :

ক. আংশিক জাতীয়করণ নীতি : বঙ্গবন্ধুর সরকার শিল্পপ্রতিষ্ঠান, ব্যাংক ও বীমা জাতীয়করণ করে সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনেন। কিন্তু এ সরকার বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান ক্ষেত্রে কৃষিব্যবস্থাকে জাতীয়করণ করেনি। তাছাড়া জমির মালিকানার ক্ষেত্রে সরকার ১০০ বিঘা পর্যন্ত জমির সিলিং নির্ধারণ করলেও বাস্তবে তা কার্যকর হয়নি।

খ. শিল্পপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার জটিলতা : আওয়ামী লীগ আমলে শিল্পপ্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করলেও সেগুলো পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তৈরি করতে পারেনি। তাছাড়া শিল্পপ্রতিষ্ঠান

পরিচালনার দায়িত্ব অনভিজ্ঞ দলীয় কর্মীদের উপর ন্যস্ত করায় জটিলতার সৃষ্টি হয়।

গ. প্রাকৃতিক দুর্যোগ : শেখ মুজিবুর রহমানের আমলে দেশে খরা, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি ও বন্যা দেখা দেয়। তখনকার যুদ্ধ বিধ্বস্ত ভঙ্গুর অর্থনীতিতে এ সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা করার সামর্থ্য আওয়ামী লীগ সরকারের ছিল না।

ঘ. উৎপাদন হ্রাস মুদ্রাস্ফীতি : শেখ মুজিবুর রহমানের আমলে জাতীয়করণকৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের অদক্ষ পরিচালনা ও প্রশিক্ষণের অভাবে উৎপাদন হ্রাস পায় এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বেড়ে দ্বিগুণ হয়ে যায়। তাছাড়া এসব জিনিসের দুষ্প্রাপ্যতার কারণে মুদ্রাস্ফীতি দেখা যায়। ফলে জনগণের নিকট আওয়ামী লীগ সরকারের জনপ্রিয়তা হ্রাস পেতে থাকে।

৮. রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যর্থতা : শেখ মুজিবুর রহমানের আমলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন :

ক. সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনীও বাকশাল গঠন : বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় পদ্ধতির পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা এবং বহুদলীয় শাসনব্যবস্থার পরিবর্তে একদলীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। এ সম্পর্কে লন্ডন ডেইলী টেলিগ্রাফ মন্তব্য করে যে, শেখ মুজিবুর রহমান গণতন্ত্রের শেষ চিহ্নটুকু লাথি মেরে ফেলে দিয়েছেন এবং বাংলাদেশে প্রায় নিঃশব্দে গণতন্ত্রের কবর রচনা করা হয়েছে। একদলীয় ব্যবস্থা বাকশালকে মানুষ মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেনি।

খ. মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন : আওয়ামী লীগ শাসনামলে মাত্র ৪টি জাতীয় পত্রিকা বাদে সব ধরনের সংবাদপত্র বন্ধ করা, বিচার বিভাগের ক্ষমতা হ্রাস করা এবং জনগণের মৌলিক অধিকার খর্ব করা হয়। ফলে এ সরকার জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

গ. জেলা গভর্নর পদ্ধতি : আওয়ামী লীগ শাসন আমলে বাকশাল ব্যবস্থায় বিদ্যমান মহকুমাগুলোকে পুনর্গঠন করে ৬০টি জেলায় রূপান্তরিত করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এ সকল জেলাসমূহের দায়িত্বভার আমলাদের পরিবর্তে বাকশাল এবং মনোনীত ব্যক্তিবর্গের হাতে ন্যস্ত করার সিদ্ধান্ত হয়। যার ফলে আমলারা এরূপ পদ্ধতিকে কিছুতেই গ্রহণ করতে পারেনি।

ঘ. বামপন্থি রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মকাণ্ড : বামপন্থি রাজনৈতিক দলগুলো বাংলাদেশের বিপ্লবকে অসমাপ্ত বিপ্লব মনে করে এবং দলগুলো দ্বিতীয় বিপ্লবের মাধ্যমে অর্থনৈতিক মুক্তি আনয়নে তৎপর হয়ে উঠে। বিশেষ করে বামপন্থি রাজনৈতিক দলগুলো হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ, গুপ্ত হত্যা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ও জ্বালাও পোড়াও কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তোলে। আওয়ামী লীগ সরকার বিশেষ ক্ষমতা আইন এবং জরুরি আইন প্রয়োগ করেও নৈরাজ্যজনক পরিস্থিতির উন্নতি করতে সক্ষম হয়নি।

৯. সামরিক ক্ষেত্রে ব্যর্থতা : শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলে সামরিক ক্ষেত্রে যেসকল ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয় সেগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো :

ক. সেনাবাহিনীতে পাকিস্তান আমলের প্রভাব : পাকিস্তান আমল থেকেই সেনাবাহিনী রাজনৈতিক ক্ষমতার সাথে জড়িত ছিল। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের পরপরই সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরে যেতে হয়। পরবর্তীকালে বিভিন্ন কারণে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের ব্যর্থতায় সেনাবাহিনী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে।

খ. সামরিক বাহিনীর প্রতি উপেক্ষা : পাকিস্তানি শাসনামলে প্রতিরক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ ছিল শতকরা ৭৮ ভাগ। কিন্তু বাংলাদেশ সৃষ্টির পর ক্রমান্বয়ে সামরিক বাহিনীর সুযোগ সুবিধা কমিয়ে দেয়া হয়। ১৯৭৫-৭৬ অর্থ বছরে প্রতিরক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ ছিল শতকরা ১২.৫ ভাগ। ফলে সামরিক বাহিনীর মধ্যে চাপা ক্ষোভের সঞ্চার হয়।

গ. **সামরিক স্থাপনা মেরামত ও সংস্কার না করা :** যে সামরিক বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করা হয় নাই তা নয় বরং স্বাধীনতা যুদ্ধে বিধ্বস্ত দেশের বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টের বিভিন্ন অংশে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও অন্যান্য সাজসরঞ্জাম পর্যন্ত দ্রুতগতিতে মেরামত বা নতুনভাবে নির্মাণ করা হয়নি।

ঘ. **রক্ষী বাহিনীর প্রতি আনুকূল্য প্রদর্শন :** আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক সামরিক বাহিনীর সমান্তরাল হিসেবে রক্ষীবাহিনী নামক এক আধা সামরিক বাহিনী গড়ে তোলা হয়। ১৯৮০ সাল নাগাদ এই বাহিনীর সংখ্যা ১,২০,০০০ এ উন্নীত করার পরিকল্পনা ছিল এবং এও পরিকল্পনা ছিল যে, প্রত্যেক জেলায় তার একটি ইউনিট স্থাপন করা হবে। মুজিব সরকার ক্রমেই এই বাহিনীর প্রতি অতিরিক্ত নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। তাছাড়া রক্ষী বাহিনীর বাড়াবাড়িও দেশের মানুষকে শঙ্কিত করে তোলে। রক্ষী বাহিনীর দ্রুত উন্নয়ন এবং তার প্রতি আওয়ামী লীগের দুর্বলতা ও সাময়িক বাহিনীর কর্মকর্তাদের বিক্ষুব্ধ করে তোলে।

ঙ. **বঞ্চনা ও জুলুম :** সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাদের বরখাস্ত ও নানাভাবে বঞ্চিত এবং অপদস্ত করা হয়। পাকিস্তান ফেরত সামরিক আমলা, অফিসার ও সৈনিকরা ১৮ মাস কোনো বেতন পাননি। পদোন্নতি প্রদানেও তাদের বঞ্চিত করা হয়। ফলে পাকিস্তান প্রত্যাগত সেনা অফিসাররা মুজিব সরকারের প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

১০. রুশ-ভারত ঘেঁষা পররাষ্ট্রনীতি : আওয়ামী লীগ সরকার জোট নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতিতে বিশ্বাসী হলেও বাস্তবে বঙ্গবন্ধু সরকার রুশ-ভারত ঘেঁষা পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করতে থাকে। ফলে সামরিক বাহিনী ও জনগণের মনে অসন্তোষ বিরাজ করতে থাকে। কেননা ভারতের নেতৃত্বকে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনী সন্দেহের চোখে দেখত। স্বাধীনতা যুদ্ধে পাকিস্তান বাহিনীর নিকট থেকে দখলকৃত অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ভারতীয় বাহিনী নিয়ে যায়। তাছাড়া সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার সাথে এ দেশের জনগণ পরিচিত ছিল না। যে কারণে জনগণ বিরোধী দলগুলোর প্রচারণায় রুশ-ভারত বিরোধী মনোভাবাপন্ন হয়ে ওঠে।

আন্তর্জাতিক চক্রান্ত : অনেক বিশ্লেষক মনে করেন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার আন্তর্জাতিক চক্রান্তের শিকারে পরিণত হন। বঙ্গবন্ধু ছিলেন একজন খাঁটি দেশপ্রেমিক। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে তার বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।[৩২]

১১. শহিদ ও সম্ভ্রমহারা নারীদের তালিকা প্রস্তুত না করা : আনন্দের ধ্বনি উঠেছিল ১৬ ডিসেম্বরের পরে। তার নিচে চাপা পড়ে গেছে উৎপীড়িতের ক্রন্দন ধ্বনি। কত মানুষ শহিদ হয়েছে, কত নারীর যে সম্ভমহানি ঘটেছে তার কোনো তালিকা তৈরি হয়নি। তদন্তহীন দুটি বড় সংখ্যার অধীনে হারিয়ে গেছে প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতি ও আর্তনাদ। এটি একটি ব্যর্থতা এবং মোটেই তাৎপর্যহীন নয়। স্বাধীনতা যুদ্ধে প্রকৃত শহীদের সংখ্যা নিয়ে বিভ্রান্তি থেকেই যায়। যুদ্ধের পর নেতারা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়নি। শহিদ-লাঞ্ছিতদের ভুলে তারা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল নিজেদেরকে নিয়ে। তালিকা তৈরি করেছে মুক্তিযোদ্ধাদের, শহীদদের বা লাঞ্ছিতদের করেনি।

১২. জাতিকে বিভক্ত করা : মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রণয়ন তাৎপর্যহীন নয়। আসলে আলবদর, রাজাকার ঘাতক ও দালাল বাদ দিয়ে বাকি সবাই তো ছিল মুক্তিযোদ্ধা। কোননা যে কোনোভাবেই হোক দেশের সর্বস্তরের জনগণ জড়িত ছিল যুদ্ধের সঙ্গে। তালিকা তৈরি করা দরকার ছিল হানাদারদের ওই সহযোগীদের। তাহলেই মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রস্তুত হয়ে যেত। যুদ্ধে জয় একটি সমষ্টিগত অর্জন, মুক্তিযোদ্ধাদের একটি কৃত্রিম তালিকা সংকলন করার ভেতর সেই অর্জনকে ব্যক্তিগত গৌরবে ও সুযোগে পরিণত করার চেষ্টা চলে। মুক্তিযোদ্ধাদের ওই তালিকা প্রণয়ন এখনো শেষ হয়নি।

১৩. নকল প্রবণতা বৃদ্ধি : শিক্ষার্থীদের জন্য আরেকটা সুবিধা করে দেয়া হয়েছিল। সেটাও কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। যুদ্ধের নয়মাস দেশে লেখাপড়ার পরিবেশ ছিল না। লেখাপড়া সম্ভব ছিল না। যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই যে পরিবেশ উন্নত হয়ে গেছে তা নয়। ১৯৭১ সালটি নষ্ট হয়ে

গেছে বলেই ধরে নিতে হতো। কিন্তু সংক্ষিপ্ত সিলেবাসে পরীক্ষা নিয়ে ছাত্র ছাত্রীদের পাস করিয়ে দেয়া হলো। ফলে শিক্ষা জীবনের একটি স্থায়ী শূন্যতা সৃষ্টি হলো। তাছাড়া এই মনোভাবও তৈরি হলো যে বাংলাদেশে সবকিছুই সহজ হবে, সকলের জন্য নয় অবশ্য, শিক্ষিতদের জন্য। সেই সঙ্গে নকল শুরু হলো। নকলের এমন ব্যাধি আগে কখনো দেখা যায়নি। এও লুণ্ঠনেরই মনোভাব। অভিভাবকেরা উৎসাহ দিলেন। যাদের বাধা দেওয়ার কথা সেই শিকরেরাও রণে ভঙ্গ দিলেন। জয়ের পিছনে এক মহাপরাজয়ের ছায়া। স্বাধীনতা থেকে জন্ম হয় দায়িত্ববোধ, কিন্তু ছাত্র সমাজের মধ্যে দায়িত্ববোধের পরিবর্তে নকল বৃত্তি শক্তিশালী আসন গাড়ে। ফলে জাতীয় মূল্যবোধে অবক্ষয় দেখা দেয়। শিক্ষার মানের সুষ্ঠু পরিবেশ বিঘ্নিত হয়ে দেখা দেয় সন্ত্রাস।

১৪. যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার না করা : মুজিব সরকারের একটি বড় ব্যর্থতা ছিল যুদ্ধ অপরাধীদের বিচার না করা। পাকিস্তানি খুনীরা সবাই চলে গেছে। সর্বাধিক অপরাধী যারা তাদেরকেও আটক করা যায়নি। প্রথমে ঠিক হয়েছিল ৪০০ জন পাকিস্তানি যুদ্ধাপরাধীর বিচার হবে। পরে কমিয়ে এনে করা হলো ১৯৫, আরো পরে ১১৮। অবশেষে একজনের ও বিচার করা হয়নি।[৩৩]

১৫. রাজাকার আল বদরদের চিহ্নিত করতে না পারা : দুঃখ এবং লজ্জার ব্যাপার হলো এই যে, রাজাকার, আল বদরদের চিহ্নিত করা গেল না। কারো কারো শাস্তি হওয়া অত্যাবশ্যকীয় ছিল, অনেককেই সামাজিকভাবে বর্জন করা কর্তব্য ছিল, আমাদের জাতিগত ভবিষ্যতের স্বার্থে। খোঁজ নেয়া হয় নাই নাম না জানা শহিদ ও লাঞ্ছিতদের, খোঁজ নেয়া হয় নাই, আলবদর রাজাকারদের। রাষ্ট্র বদলেছে। ব্রিটিশের রাষ্ট্র ছিল অনেক বড়। সেই তুলনায় পাকিস্তান ছোট, বাংলাদেশ আরো ছোট। নাম, সংবিধান, পতাকা, জাতীয় সংগীত সবই স্বতন্ত্র। কিন্তু পুনরায় স্মরণ করা যেতে পারে যে রাষ্ট্র বদলায়নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেই ব্রিটিশ আমলের ধারাবাহিকতাই রক্ষা করে চলেছে।

১৬. জাতি গঠনে ব্যর্থ : কথা ছিল জাতি গঠনের, বাস্তবে যা ঘটল তা হলো শ্রেণি বিকাশের কাজটাকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। ধারণা করা হয়েছিল যে, বাংলাদেশ হবে একটি জাতি রাষ্ট্র। কিন্তু সেটা ছিল একটা বড় ক্ষতিকর ভুল। হ্যাঁ একটি জাতীয়তাবাদী সংগ্রামের প্রতিক্রিয়াতেই বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা। এর বেশিরভাগ মানুষই বাঙালি, রাষ্ট্রভাষাও বাংলা কিন্তু তাই বলে এটি কেবল বাঙালির রাষ্ট্র নয়, এখানে আরো অনেকগুলো জাতিসত্তা রয়েছে। তাদের সদস্যসংখ্যা অল্প : কিন্তু তাই বলে তারা অস্তিত্বহীন নয়। চাকমা, ত্রিপুরা, মারমা, মোরং, সাঁওতাল, হাজং, গারো, বিহারী এরকম প্রায় ৪৫টি ক্ষুদ্র জাতিসত্তা রয়েছে। তারা বাঙালি নয়, তাদেরকে বাঙালি হতে বলা সেরকমের অন্যায় কাজ যা পাকিস্তানিরা একদা করেছিল। পাকিস্তানের অধিকাংশ নাগরিক মুসলমান এই যুক্তিকে ফ্যাসিবাদী কায়দায় রাষ্ট্রকে ইসলামি প্রজাতন্ত্র করা হয়েছিল। বাংলাদেশের অধিকাংশ নাগরিক বাঙালিই থাকবে। তবে রাষ্ট্রে অবাঙালিরাও রয়েছে এবং বাঙালিরাও কেবল বাংলাদেশে নয়, পৃথিবীর নানা দেশে আছে। বেশ বড় একটা অংশ রয়েছে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে। সত্য এটাই, বাংলাদেশের বাঙালিরা জাতিতে বাঙালি কিন্তু নাগরিকত্বে বাংলাদেশি।

১৫. কমিউনিস্ট বিরোধী : বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) দিক থেকে এমন আশা করা হয়েছিল যে সংবিধান রচনার লক্ষ্যে গণপরিষদে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী দলগুলো থেকে অন্তত আটজনকে মনোনীত সদস্য হিসেবে গ্রহণ করা হবে। পার্টির নেতা মণি সিং কথাটা তুলেছিলেন। সদস্য হিসেবে গ্রহণ না করা হলে অন্তত একটি পরামর্শ সভা গঠন করা হবে এমন একটা ধারণা শুরুতে পাওয়াও গিয়েছিল। কিন্তু পরে কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ১৯৭৩ সালের ১ জানুয়ারি ভিয়েতনাম দিবস পালনের উদ্দেশ্যে ছাত্র ইউনিয়নের মিছিল মার্কিন তথ্য কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হতে চেষ্টা করলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কাছে পুলিশ গুলি ছুঁড়ে বাধা দেয়ায় তাতে একজন ছাত্র প্রাণ হারায়। আওয়ামী লীগ উগ্রপন্থী বামকেই তার প্রধান শত্রু বলে চিহ্নিত করেছিল।

১৬. শক্তিশালী বিরোধীদল প্রতিষ্ঠায় ব্যর্থ : স্বাধীনতার পর শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি হিসেবে পদত্যাগ করে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। একটা খুবই সংগত কাজ হয়েছিল বলে বিশ্লেষকরা মনে করেন। আশা করা গিয়েছিল দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। সংসদীয় গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত একটি শক্তিশালী বিরোধী দলের কার্যকর অস্তিত্ব। শেখ মুজিব অসামান্য জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগিয়ে আওয়ামী লীগ বিরোধীদলের আত্মপ্রতিষ্ঠার কাজটিকে বিঘ্নিত করেছে।

১৭. ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং : ব্যালট বাক্স বদলানো শূন্য বাক্স পূর্ণ করা, পূর্ণবাক্স শূন্য করা, জাল ভোটদান, ভোটাররা ভোটদানে বিরত থাকলেও নির্বাচন সম্পন্ন বলে ঘোষণা করা, ভোট গণনায় ও প্রকাশে কারচুপি করা, অনির্বাচিতকে নির্বাচিত আর নির্বাচিতকে অনির্বাচিত বলে চালিয়ে দেয়া প্রভৃতি শুরু হয়- ১৯৭৩ থেকে।[৩৪]

১৮. কোথায় আজ সিরাজ সিকদার ? ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের অতিনিষ্ঠুর ও অবিশ্বাস্য হত্যাকাণ্ড ঘরের গোপন শত্রুরাই ঘটিয়েছে, দূরের প্রকাশ্য শত্রুরা নয়। খন্দকার মোশতাকরা আওয়ামী লীগের সেই অংশের লোক যারা নিজেদের অকমিউনিস্ট নয় এন্টি কমিউনিস্ট বলে বড়াই করত। তথাকথিত নকশালপন্থিদের শেখ মুজিবুর রহমান কতটা অপছন্দ করতেন সেটা বোঝা যায় সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী উপস্থাপন উপলক্ষে জাতীয় সংসদে দেয়া তাঁর বক্তব্যটি শুনলে। ১৯৭৫ সালের ২৫ জানুয়ারি বাকশাল নামে চিহ্নিত সংশোধনটি উত্থাপন করা হয়। ওই দিন যে বক্তৃতাটি সেদিন টেলিভিশনের সাহায্যে সরাসরি প্রচারিত হয়েছিল তার প্রথমাংশেই তিনি বলেছিলেন কোথায় আজ সিরাজ সিকদার। তাকে যদি ধরা যায় তাহলে অন্যদের কেন ধরতে পারব না। যাদেরকে ধরা তার জন্য কেবল সময়ের ব্যাপার তাদের একটি তালিকাও দিয়েছিলেন। এরা হলেন ঘুষখোর অফিসার, বিদেশি এজেন্ট, সম্পদ লুণ্ঠনকারী মজুতদার ও চোরাচালানকারী। কথিত আছে এই ভাষণের, পূর্বে সিরাজ সিকদারকে হত্যা করা হয়েছিল।[৩৫]

১৯. শরণার্থী সমস্যা সমাধানে অপারগ : ধারণা করা হয় ১৯৭১ সালে যারা শরণার্থী হিসেবে ভারতে যায় তাদের মধ্যে সাত লক্ষ ধারণা করা হয় পশ্চিমবঙ্গে থেকে যায়।[৩৬] কেননা ১৯৭১ সালে শরণার্থী হয়ে ভারতে আশ্রয়

নেয়া অনেকেই স্বাধীনতার পর দেশে ফিরতে চাইলেও ফিরতে পারেনি। এর কারণ তারা জানতে পারে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় তারা তাদের যে সহায় সম্বল ফেলে রেখে এসেছিল তার কিছুই আর তাদের নেই। সবই গ্রাস করে নিয়েছে আশেপাশের দীর্ঘদিনের প্রতিবেশিরা। ১৯৭২ সালে মুজিব সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর শরণার্থীদের এ সমস্যা দূর করতেও ব্যর্থ হয়।

২০. বিহারী সমস্যা সমাধানে অপারগ : সৈয়দপুরে, সান্তাহারে, ময়মনসিংহে, ঢাকায়, চট্টগ্রামে বিহারীদের ও পাকিস্তানি ব্যবসায়ীদের কলকারখানা, দোকান, বাড়িঘর সব বিনে পয়সায় দখল করে নেয় বাঙালিরা। ওদের কেউ কেউ পালিয়ে গেছে অনেকে নিহত হয় আর অধিকাংশ উদ্বাস্তু, চাকরি ও পেশাচ্যুত হয়ে জেনেভা ক্যাম্পে আশ্রিত থাকে। আন্তর্জাতিক ত্রাণ শিবিরে যারা আছে এখনো তাদের অনেকের বাড়ি ছিল ঢাকার লালমাটিয়ায় মুহাম্মদপুরে, মিরপুরে ও অন্যত্র।[৩৭] স্বাধীনতার পর মুজিব সরকার বিহারীদের এ সমস্যা সমাধানেও তেমন কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি।

২১. সীমান্ত পাচার : মুজিব সরকার কর্তৃক সম্পাদিত সীমান্ত বাণিজ্য চুক্তি প্রকারন্তরে চোরাচালানকে উৎসাহিত করে তোলে। ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্যে সীমান্ত পাচার এত মারাত্মক আকার ধারণ করে যে পাট, খাদ্যদ্রব্য, ধাতব মুদ্রা, চা ইত্যাদি অবাধে ভারতে পাচার হয়ে যেত। এতে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা পঙ্গু হয়ে পড়ে।[৩৮]

শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলের উপর্যুক্ত ব্যর্থতার ফলে জনমনে ব্যাপক হতাশার সৃষ্টি হয়। কেননা যে প্রত্যাশা নিয়ে জনগণ ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেই প্রত্যাশা পূরণ না হবার কারণেই তাদের এ হাতাশা। জনমনে যখন চরম হতাশা ও ক্ষোভ বিরাজ করছিল ঠিক সেই মুহূর্তে বিপথগামী বিদ্রোহী সেনা অফিসার কর্তৃক শেখ মুজিবকে স্বপরিবারে হত্যা করা হয়। এটি অবশ্য বাংলাদেশের মানুষের কাম্য ছিল না। শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুর পর লন্ডন থেকে প্রকাশিত সানডে টাইমস ও গার্ডিয়ানের মন্তব্য ছিল শেখ মুজিবের পতনের গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো সেনাবাহিনীর প্রতি অবজ্ঞা ও ইসলামের প্রতি অমর্যাদা।

১.৪.৩ সপরিবারে বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাঙালির জাতীয় জীবনে ঘটে এক নির্মম নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড। সেদিন ভোরে স্বাধীন বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর কতিপয় উচ্চাভিলাসী ও উচ্ছৃঙ্খল সেনাসদস্য স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তির সমন্বয়ে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর সড়কের নিজ বাসায় নৃশংসভাবে হত্যা করে। বঙ্গবন্ধু পরিবারের উপস্থিত কোনো সদস্যই ঘাতকদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি। এমনকি ঘাতকের নিষ্ঠুর বুলেটের হাত থেকে রক্ষা পায়নি ১০ বছরের নিষ্পাপ শিশু রাসেলও। একটি আধুনিক ও শোষণ দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি নিয়ে বঙ্গবন্ধু যখন সমগ্র জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে দ্রুত অগ্রসর হচ্ছিলেন ঠিক তখনই দেশি বিদেশি প্রতিক্রিয়াশীল অপশক্তি মহলের সহযোগিতায় দেশের অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা ষড়যন্ত্রকারী গোষ্ঠী ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করে। এ হত্যাকাণ্ড ছিল নৃশংস মানবতা বিরোধী অপরাধ। এটি ঘটেছিল গোপন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে। ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের পর বাংলাদেশ গভীর রাজনৈতিক সঙ্কটে পড়ে। ১৫ আগস্ট আমাদের জাতীয় শোক দিবস।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট যারা নির্মমভাবে নিহত হন :

ক্রমিক নং	নাম	পরিচয়	হত্যাকাণ্ডের স্থান
১.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান	রাষ্ট্রপতি ও স্বাধীন বাংলাদেশের স্থপতি	বঙ্গবন্ধুর বাসভন
২.	বেগম ফজিলাতুন্নেসা মুজিব	বঙ্গবন্ধুর সহধর্মীনি	ঐ
৩.	শেখ কামাল	বঙ্গবন্ধুর জ্যেষ্ঠপুত্র	ঐ
৪.	শেখ জামাল	বঙ্গবন্ধুর মেঝ পুত্র	ঐ

৫.	শেখ রাসেল	বঙ্গবন্ধুর কনিষ্ঠ পুত্র	ঐ
৬.	সুলতানা কামাল কুফু	শেখ কামালের স্ত্রী	ঐ
৭.	পারভীন জামাল রোজী	শেখ জামালের স্ত্রী	ঐ
৮.	শেখ আবু নাসের	বঙ্গবন্ধুর ছোট ভাই	ঐ
৯.	জনৈক পুলিশ সদস্য	ডিএসপি	ঐ
১০.	আবদুল	কাজের ছেলে	ঐ
১১.	আবদুর রব সেরনিয়াবাত	বঙ্গবন্ধুর মন্ত্রী সভার সদস্য ও নিকট আত্মীয়	২৭ নম্বর মিন্টো রোডের বাসা
১২.	বেবি সেরনিয়াবাত	আবদুর রব সেরনিয়াবাতের কন্যা	ঐ
১৩.	আরিফ সেরনিয়াবাত	আবদুর রব সেরনিয়াবাতের পুত্র	ঐ
১৪.	সুকান্ত বাবু	সেরনিয়াবাতের নাতি ও আবুল হাসনাত আবদুল্লাহর পুত্র	ঐ
১৫.	শহীদ	আবদুর রব	ঐ

	সেরনিয়াবাত	সেরনিয়াবাতের ভাতিজা	
১৬.	আবদুল নঈম খান রিন্টু	আব্দুর রব সেরনিয়াবাতের বাসায় অতিথি হিসেবে আগত	ঐ
১৭.	পটকা	কাজের ছেলে	ঐ
১৮.	লক্ষ্মীর মা	কাজের মেয়ে	ঐ
১৯.	জনৈক ব্যক্তি	আব্দুর রব সেরনিয়াবাতের বাসায় আগত অতিথি	ঐ
২০.	শেখ ফজলুল হক মনি	আওয়ামী যুবলীগের চেয়ারম্যান এবং বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে ও ঘনিষ্ঠ সহচর	শেখ মনির বাসায়
২১.	বেগম আরজু মনি	শেখ মনির অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী	শেখ মনির বাসা
২২.	কর্ণেল জামিল উদ্দিন আহমেদ	বঙ্গবন্ধুর নিরপত্তা অফিসার	সোবহানবাগের রাস্তায়

এছাড়া মোহাম্মদপুর আবাসিক এলাকায় একটি বাড়িতে গিয়ে কামানের গোলা পড়ায় শাহবুদ্দিন, আমিরুদ্দিন, নাসিমা, রিজিয়া ও রাশেদা নামে পাঁচজন মারা যায়। বঙ্গবন্ধুর দুই কন্যা শেখ হাসিনা ও শেখ রেহেনা দেশের বাইরে থাকায় সপরিবারে তারা বেঁচে যান। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা পরবর্তীতে দেশে ফিরে আসেন এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হন।

১.৪.৪. ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যাকাণ্ডের পর ঘটে যাওয়া আদর্শিক পট পরিবর্তন

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড কেবল একজন বা কিছু ব্যক্তিকেই হত্যা করা ছিলনা। সে হত্যাকাণ্ডটির উদ্দেশ্য ছিল একটি আদর্শকে হত্যা করা। বঙ্গবন্ধুকে হত্যার উদ্দেশ্য ছিল মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে শুধু সংবিধান থেকে নয় বাঙালির মন থেকে মুছে ফেলা। স্বভাবতই হত্যাকাণ্ডটি ছিল সুপরিকল্পিত। এরপর খন্দকার মোশতাক আহমদ ক্ষমতা দখল করেন। এর তিন মাসের মধ্যেই ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের চেষ্টায় ব্যর্থ হন সামরিক বাহিনীর সমর্থনের অভাবে। কিন্তু সেই স্বল্প সময়ের মধ্যে খন্দকার মোশতাকের নির্দেশে জেলখানায় রাতের অন্ধকারে চার আওয়ামী লীগ নেতাকে নীতি নিয়ম ভঙ্গ করে কাপুরুষের মতো হত্যা করা হয়। সপ্তাহকালের মধ্যে অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক জনপ্রিয় মুক্তিযোদ্ধা কর্ণেল তাহেরের নেতৃত্বে সিপাহি বিদ্রোহের মাধ্যমে পট পরিবর্তন হয়। এর পর আসেন জিয়াউর রহমান। জিয়াউর রহমানও ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা, তাঁর ছিল ইসলাম প্রীতি। পাকিস্তানি সেনারা বাঙালি বলে তাকে হত্যা করতে চেয়েছিল। তিনি প্রথমে নিজের নামে ও পরে শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন।

বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর খন্দকার মোশতাক আহমদ ক্ষমতায় বসেই মুক্তিযুদ্ধের সময় অনুপ্রেরণা দানকারী ও জনপ্রিয় শ্লোগান 'জয় বাংলাকে' বাদ দিয়ে তার স্থলে খোদা হাফেজ ও বাংলাদেশ জিন্দাবাদ শ্লোগান পুনঃপ্রবর্তন করেন। এছাড়া রেডিও পাকিস্তান এর অনুকরণে বাংলাদেশ বেতারের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় রেডিও বাংলাদেশ। মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে মুজিব কোর্ট পরিবর্তন এবং বাংলাদেশের জন্য জাতীয় পোশাক নির্ধারণ করা হয়। পুরুষদের জন্য লম্বা গলাবন্দ কোট এবং লম্বা টুপি জাতীয় পোষাক হিসেবে গৃহীত হয়।

ক্ষমতায় এসে জিয়াউর রহমান সংবিধানের চার মূলনীতি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা এর পরিবর্তন করেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদকে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে পরিবর্তন করেন।

ধর্মনিরপেক্ষতার স্থলে সর্বশক্তিমান আল্লাহার উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস কথাগুলো সংযোজন করেন। সমাজতন্ত্রের স্থলে অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার কথাগুলো প্রতিস্থাপিত হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের পর ৫ম সংশোধনীর মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ প্রবর্তন করা হয়। ১৯৭৫ এর পট পরিবর্তনের পর রাষ্ট্র পুঁজিবাদী আদর্শের দিকে ধাবিত হয়। ফলশ্রুতিতে নির্বাসন ঘটে সমাজতন্ত্রের।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যার পর দেশে সামরিক শাসন চালু হয়। বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিচারের হাত থেকে রেহাই দেয়ার জন্য এক সামরিক অধ্যাদেশ (ইনডেমনিটি অধ্যাদেশ) জারি করা হয়। জেনারেল জিয়াউর রহমান সামরিক শাসনের মাধ্যমে ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স নামক কালো আইনটি সংবিধানে সংযোজনের মাধ্যমে সংবিধানের পবিত্রতা নষ্ট করেন। তবে তিনি বিদেশে অবস্থানরত বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে দেশে ফিরিয়ে এনে দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্রের চর্চার পথ উন্মুক্ত করেন। এছাড়া তিনি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

শেখ মুজিবুর রহমান ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করলেও জিয়াউর রহমান সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেন। ফলে জামায়াতে ইসলামিসহ অন্যান্য ধর্মভিত্তিক দলগুলো আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ পায়। জিয়াউর রহমান বক্তৃতার শুরুতে বিসমিল্লাহির রাহমানের রাহীম বলতেন। ১৯৭৮ সালে তিনি বাংলাদেশের সব দলের অংশগ্রহণে নির্বাচন দেন। নির্বাচনে বিপুল ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক দল বিএনপিও গঠিত হয় দেশের সবদলের নেতাকর্মীদের নিয়ে। শেখ মুজিব সরকার দালালি আইন জারি করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার কার্য শুরু করেন, যদিও তিনি পরবর্তীতে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। কিন্তু তিনি ধর্ষণ, খুন ও খুনের চেষ্টা, ঘরবাড়ি অথবা জাহাজে অগ্নিসংযোগের দায়ে দণ্ডিত ও অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ক্ষমা করেননি। কিন্তু জিয়াউর রহমান পরবর্তীতে দালাল আইন বাতিল করেন। বঙ্গবন্ধুর সরকার স্বাধীনতা বিরোধী অনেকের

নাগরিকত্ব বাতিল করলেও জিয়াউর রহমান তাদের নাগরিকত্ব ফিরে পাওয়ার সুযোগ করে দেন।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক মঞ্চে জিয়াউর রহমানের আবির্ভাব ছিল স্বল্পস্থায়ী। তিনি ধূমকেতুর মতো বাংলাদেশের আকাশে উদিত হয়ে ছিলেন। তার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণের সময় বাংলাদেশের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অবস্থা ছিল উত্তাল ও বিশৃঙ্খল। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞের পর দেশের শাসন ক্ষমতায় বঙ্গবন্ধু ও তার দল আওয়ামী লীগ বসলেও শেষ পর্যন্ত সেই সরকারের জনপ্রিয়তা নষ্ট হতে থাকে। সেই সরকারের অদক্ষতা ও দুর্নীতির ফলশ্রুতিতে দেশে সৃষ্টি হয় এক অরাজক অবস্থা। নেমে আসে নিষ্ঠুরতম দুর্ভিক্ষ। ১৯৭৪ সালের এই দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক মারা যায় বলে ধারণা করা হয়। বাংলাদেশ পরিচিত হয়েছিল তলা বিহীন ঝুড়ির দেশ হিসেবে।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সকালে নিহত হয়েছিলেন বাংলাদেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমান। এই ঘৃণ্য হত্যাকাণ্ডের পর সেই দিন প্রেসিডেন্টের ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও সহকর্মী খন্দকার মোশতাক আহমদ কর্তৃক সামরিক আইন ঘোষিত হয়। সারা দেশকে তিনি সামরিক শাসনের আওতায় আনেন। এরপর দেখা যায় শাসক গোষ্ঠীর অপর অংশের ৩ নভেম্বর ১৯৭৫ সালে আর এক ব্যর্থ সামরিক অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশারফের নেতৃত্বে। অভ্যুত্থান, পাল্টা অভ্যুত্থানের মাঝে কেটে যায় এক গণবিপ্লব। সিপাহী জনতার বিপ্লবে ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর মুক্ত জিয়া অধিষ্ঠিত হন শাসন ক্ষমতায়। প্রকৃতপক্ষে জিয়ার অভ্যুদয় হয়েছিল ১৯৭১ সালের ২৫ এবং ২৬ মার্চ যখন তিনি আগ্রাবাদে রাত বারটায় ঘোষণা করেন 'উই রিভোল্ট'। তারপর ২৬ মার্চ তিনি চট্টগ্রামের কালুর ঘাট থেকে একবার নিজে ও পরের বার বঙ্গবন্ধুর পক্ষ থেকে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এরপর আবার ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বরে।

১৯৭২ সালের এপ্রিল মাসে জেনারেল এম. এ জি ওসমানী কমান্ডার ইন চীফ এর পদ থেকে সরে যাওয়ার সময় এলে সেনাবাহিনীর একজন

প্রধান দরকার হয়ে পড়েছিল। অনেক বিশ্লেষক ধারণা করেন জেনারেল ওসমানীর সুপারিশেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সিনিয়রকে বাদ দিয়ে জুনিয়র তৎকালীন কর্ণেল শফিউল্লাহকে সেনাপ্রধান নিযুক্ত করেন। এভাবে সেনাবাহিনীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। অনেকে মনে করেছিলেন সেনাপ্রধান হতে না পারায় এবং কনিষ্ঠের অধীনে চাকরি করার অপমান থেকে বাঁচার জন্য তিনি স্বেচ্ছায় অবসরে যেতে পারেন। কিন্তু জিয়া তা করেননি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট এবং নভেম্বরে তার মনের ক্ষোভ প্রকাশের সুযোগ থাকলেও তিনি সেই ষড়যন্ত্রের অন্ধপথে জাননি। ১৯৭৪ সালে তিনি সেনাবাহিনীর উপপ্রধান ছিলেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শেখ মুজিব নিহত হওয়ার পর সেনাপ্রধান হিসেবে এই মর্মান্তিক ঘটনা রোধ করতে না পারার ব্যর্থতার জন্য হোক বা রাজনৈতিক কারণে হোক মেজর জেনারেল শফিউল্লাহকে সেনাপ্রধানের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয় এবং ২৫ আগস্ট ১৯৭৫ থেকে নতুন সেনাপ্রধান হন মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান। ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্টের প্রতিবাদে ৩ নভেম্বর ১৯৭৫ এ অনুষ্ঠিত হয় এক প্রতিবিপ্লব। বিশ্লেষকদের মধ্যে কেউ বলেছেন এটা ছিল দেশপ্রেমসুলভ বিদ্রোহ, আবার কেউ বলেছেন এটা ভারতপন্থি সেনা অফিসারগণের ক্ষমতা আরোহণের প্রচেষ্টা। তৎকালীন জাসদ তাদের বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের আবেদনে বহু যুবককে মোহাবিষ্ট করে রাজপথে প্রাণ দিতে প্ররোচিত করেও যখন লক্ষ্যে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয় তখন ক্ষমতায় আরোহণের একমাত্র পথ হিসেবে সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত নেয়। গোপনে রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন চাকরিরত সৈনিকদের নিয়ে। সেই গোপন সংগঠনগুলো রাজনৈতিক দল (জাসদ) এর সহায়তায় এক অশ্রুতপূর্ব বিদ্রোহের সূচনা করে ৭ নভেম্বর ভোর ৩টার আগেই। সে সময়ে বৃহত্তর সৈনিক সমাজের দেশপ্রেমিক ও রাজনীতি নিরপেক্ষ সদস্যরা ঢাকা মহানগরীর জনগণের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই অশুভ তৎপরতা প্রতিহত করে। সেনাবাহিনী ও দেশ রক্ষা পায়। তৎকালীন সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান (যিনি ৩ নভেম্বর বিদ্রোহীদের হাতে বন্দি হয়েছিলেন) মুক্ত হয়েই সেনাবাহিনীর দায়িত্ব পুনরায় গ্রহণ করেন। এদিকে প্রতিবিপ্লবে মুক্তিযুদ্ধের সময় সেক্টর কমান্ডারের দায়িত্ব পালনকারী খালেদ মোশাররফ নির্মর্মভাবে নিহত হন।

জিয়াউর রহমান ক্ষমতা গ্রহণ করার পর জাতির সংকটময় মুহূর্তে প্রথমেই প্রতিশ্রুতি দেন।

১. পূর্ণ গণতন্ত্র কায়েম করা হবে।

২. জনগণের হাতে অধিকার প্রত্যার্পণ করা হবে।

৩. সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ সব মৌলিক অধিকার ফিরিয়ে দেয়া হবে।

৪. বিচারালয়ের মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হবে।

৫. আইনের শাসন চালু করা হবে।

পরবর্তীতে তিনি এই প্রতিশ্রুতি পালনের চেষ্টা করেছিলেন। জিয়া সামরিক আইন পেয়েছিলেন উত্তরাধিকার সূত্রে। তিনি দেশের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক প্রশাসকের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন ১৯৭৭ সালের ২০ এপ্রিল। দায়িত্ব গ্রহণের পরই তিনি দেশে পুনরায় বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৭৭ সালের ২০ এপ্রিল পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট ও সিএমএল-এর দায়িত্ব পালন করেন বিচারপতি সায়েম। তিনি ১৯৭৮ সালে অবাধ সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৯৭৯ সালের সংসদ নির্বাচনের পর তিনি সামরিক আইন প্রত্যাহার করে দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্রের সূচনা করেন। ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর জিয়া সেনাপ্রধানের পদ থেকে অপসারিত হয়ে বন্দি হয়েছিলেন; পরে সিপাহী জনতার প্রবল চাপে পূর্বপদে অধিষ্ঠিত হন।

ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ও কর্ণেল জামিলের নেতৃত্বে ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর সামরিক অভ্যুত্থান হয়। জেনারেল জিয়া তাদের এ বেআইনি কার্যকলাপে সায় না দেয়ায় আর্মি চীফ জেনারেল জিয়াকে গ্রেফতার, পদচ্যুতি ও খালেদ মোশাররফকে আর্মি চীফ করা হয়। খন্দকার মোশতাক আহমদের কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেয়ার পর আওয়ামী লীগ ছাত্রলীগ এবং মুজিব সমর্থিত দলগুলো মাঠে নেমে পড়ে। ৪ নভেম্বর মঙ্গলবার তারা মুজিব দিবস পালন করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শহীদ

মিনারসহ ঢাকা ও দেশের বিভিন্ন স্থানে স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হয়। একটি মিছিল ধানমণ্ডির ৩২ নম্বর সড়কে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে গিয়ে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে। সে মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন খালেদ মোশাররফের মা, তার ভাই পরবর্তীতে আওয়ামী লীগের মন্ত্রিসভার সদস্য রাশেদ মোশাররফ ও বেগম মতিয়া চৌধুরী। ৭ নভেম্বর শুক্রবার শেখ মুজিবের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শোকসভার আয়োজন করে। এদিকে জেনারেল জিয়াকে পদচ্যুতি ও বন্দি করা ও খালেদ মোশাররফকে আর্মি চীফ হওয়াকে সাধারণ সৈনিকগণ সহজভাবে গ্রহণ করেননি। তাদের মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এরই সুযোগে জাসদ গণবাহিনীও বিপ্লবী সৈনিক সংস্থার মাধ্যমে জিয়ার ভাবমূর্তি কাজে লাগিয়ে জাসদ ও কর্ণেল তাহের ক্ষমতা দখলের অপচেষ্টা চালায়। সাধারণ সৈনিকরা জিয়াকে ৬ নভেম্বর রাত বারটার পর বন্দিদশা থেকে মুক্ত করে নিয়ে আসে।

প্রেসিডেন্ট জিয়া ১৯৭৯ সালে সংসদীয় নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছিলেন। এরপর তিনি বিরোধী দলের বিভিন্ন গ্রুপের সাথে বসেছিলেন। আলোচনার ভিত্তিতেই প্রথম নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করা হয়েছিল ১৯৭৯ সালের ৩ জানুয়ারি। কিন্তু তখনকার প্রধান বিরোধীদল আওয়ামী লীগ এ নির্বাচন থেকে দূরে থাকার ঘোষণা দেয়। কারণ তখন তাদের ঘর গোছানোর প্রক্রিয়া চলছিল। আওয়ামী লীগকে আরো সময় দেয়ার জন্য জিয়া নির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে জানুয়ারির পরিবর্তে ১৮ ফেব্রুয়ারি করেন। ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি জিয়াউর রহমান সরকার দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আয়োজন করেন। এই নির্বাচনে বিএনপি ও আওয়ামী লীগসহ ২৯টি রাজনৈতিক দল অংশ নেয়। শেখ মুজিবুর রহমানের আমলে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ছিল। তাছাড়া বেশ কয়েকটি বামপন্থী রাজনৈতিক দল নির্বাচন বর্জন করেছিল। জিয়ার আমলে বাংলাদেশ সাম্যবাদী দল, ইউনাইটেড পিপলস পার্টি ও বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রার্থী হিসেবে বেশ কিছু বামপন্থী রাজনৈতিক নেতা নির্বাচনে অংশ নেন। আওয়ামী লীগ আমলে নিষিদ্ধ ঘোষিত মুসলিম লীগ ইসলামি ডেমোক্রেটিক লীগ এবং নেজাম ই ইসলামি নির্বাচনে অংশ নেয়ার সুযোগ পায়। বিএনপি ৩০০ আসনের মধ্যে ২০৭টি এবং আওয়ামী লীগ ৩৯টি

আসনে জয়লাভ করে। দ্বিতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর রাষ্ট্রপতি জিয়া সামরিক আইন তুলে নেয়ার উদ্যোগ নেন। ১৯৭৯ সালের ৬ এপ্রিল পঞ্চম সংশোধনী কার্যকর হলে ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট খন্দকার মোশতাক আহমদ কর্তৃক জারিকৃত সামরিক আইনের অবসান ঘটে। এরপর থেকে দেশে বহুদলীয় গণতন্ত্রের পথ আর রুদ্ধ হয়নি। পরবর্তীতে হুসাইন মোহাম্মদ এরশাদ, বেগম খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনা সরকার ক্ষমতায় এলেও ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ হয়নি। এছাড়া তারা সবাই কৌশলগত কারণে জামায়াতে ইসলামির সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে রাজনীতি করেছেন। প্রেসিডেন্ট জিয়া ১৯৮১ সালের ৩০ মে মেজর জেনারেল আবদুল মঞ্জুর বীর উত্তমের নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর কতিপয় বিপথগামী উর্ধ্বতন আর্মি কর্তৃক চট্টগ্রামের সার্কিট হাউসে আক্রান্ত হয়ে নিহত হন। এরপর এরশাদ ক্ষমতা দখল করেন। তিনি সংবিধানের ৮ম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেব ঘোষণা করেন।

তথ্য নির্দেশ

১. মো. আবদুল ওদুদ ভূঁইয়া, বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০৫, পৃষ্ঠা-২৮৮।

২. আতাউস সামাদ, দুই দশকের রাজনীতি, Bangladesh : Past Two, Decades and the current Decade (Kazi Khaliliquzaman Ahamed ed. Dhaka. 1994. P-456.

৩. মওদুদ আহমদ, বাংলাদেশ : শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ৬।

৪. সংবিধান প্রণয়ন প্রক্রিয়া সংবিধান সম্পর্কে রাজনৈতিক নেতাদের প্রতিক্রিয়া সংবিধানের বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি অংশসমূহ প্রবন্ধাকারে বাংলাদেশের সংবিধানের ইতিহাস (১৯৭১-১৯৭২) প্রথম প্রকাশ ঢাকা তাম্রলিপি, ২০০৯, পৃষ্ঠা - ৫৫ - ১৭১) গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে।

৫. মওদুদ আহমদ, 'বাংলাদেশ : শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১৬১।

৬. কবিবুর রহমান ও অন্যান্য, 'স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস', প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৪, পৃষ্ঠা ৬৪৯-৬৫৪।

৭. মো. আবদুস সালাম ও অন্যান্য, 'স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস', প্রথম প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৪ পৃষ্ঠা-৪০৫-৪১০।

৮. মওদুদ আহমদ, 'বাংলাদেশ : শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা -৪৯।

৯. মোহাম্মদ ফরাস উদ্দিন, 'বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ : কৃষি ও কৃষকদের দেশ' : বেতার বাংলা, আগস্ট, ১৯৯৭-পৃষ্ঠা ৩৩-৩৪।

১০. আবদুল্লাহ আল মুতী, 'বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশের শিক্ষা' : বেতার বাংলা, আগস্ট, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ২৯-৩১।

১১. মো. মাহবুবুর রহমান, 'যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে বঙ্গবন্ধুর সংস্কার কর্মসূচি', মৃত্যহীন স্মারকপত্র : জাতীয় শোক দিবস, ২০০৯ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ-৩২-৩৪।

১২. তদেব, পৃষ্ঠা -৪৬।

১৩. জাতির উদ্দেশ্যে ঐতিহাসিক মে দিবসে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান প্রদত্ত বেতার ভাষণ, এই দেশ এই মাটি পৃ. ১৯৫-১৯৯।

১৪. আবু আল সাঈদ, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা ১২৪।

১৫. ইত্তেফাক, ২২.১.১৯৭৫ ইং।

১৬. Jahan, Rounaq, Bangladesh politics : Problems and Issuses Dhaka. The University Press Limited 1990- P-177..

১৭. আদম শুমারি রিপোর্ট-১৯৭৪ দ্রষ্টব্য।

১৮. মাওলানা আবদুল আউয়াল, বঙ্গবন্ধু ও ইসলামী মূল্যবোধ : বেতার বাংলা, বর্ষ ২৫, সংখ্যা ১২, ১৫ আগস্ট -১৯৯৬, পৃষ্ঠা ৯৯-১০১।

১৯. মমতাজ উদ্দীন পাটোয়ারী ও জি এম তারিকুল ইসলাম (সম্পাদিত) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : বহুমাত্রিক মূল্যায়ন, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা, জুলাই-২০০৯- পৃষ্ঠা - ২৫।

২০. তদেব, পৃষ্ঠা - ২৬-২৭।

২১. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৭।

২২. তদেব, পৃষ্ঠা- ২৮।

২৩. তদেব, পৃষ্ঠা - ২৯।

২৪. তদেব, পৃষ্ঠা - ২৯।

২৫. তদেব, পৃষ্ঠা- ৩১।

২৬. মওদুদ আহমদ, 'বাংলাদেশ : শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৭২।

২৭. মোনায়েম সরকার (সম্পাদিত), 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান : জীবন ও রাজনীতি', দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা বাংলা একাডেমি-২০০৮- পৃ-৭০৯।

২৮. মওদুদ আহমদ, 'বাংলাদেশ : শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনকাল', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-২৭০-২৮১।

২৯. তদেব, পৃষ্ঠা - ২৪০।

৩০. আবদুল ওদুদ ভূঁইয়া, 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক উন্নয়ন', পূর্বোক্ত, ঢাকা-২০০৫, পৃষ্ঠা-২৯৪।

৩১. কবিবুর রহমান ও অন্যান্য, 'স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৬৭২-৬৭৭।

৩২. মোঃ আবদুস সামাদ ও অন্যান্য, 'স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস', পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪৫৬-৪৫৮।

৩৩. আতাউস সামাদ, দুই দশকের রাজনীতি; Bangladesh : Past Two Decades and the Current Decade (Kazi Khaliquzzaman Ahamed), Dhaka, 1994p 457.

৩৪. আহমদ শরীফ, 'সমাজ সংস্কৃতির স্বরূপ', প্রথম প্রকাশ, ঢাকা ২০১২, পৃষ্ঠা-১৬৯।

৩৫. উদ্ধৃত, গাজী শামসুর রহমান, 'বাংলাদেশের সংবিধানের ভাষ্য', ঢাকা, পৃষ্ঠা-১২২০।

৩৬. আহমদ শরীফ, সমাজ সংস্কৃতির স্বরূপ, পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা-১৬৯।

৩৭. তদেব, পৃষ্ঠা ১৬৯।

৩৮. কবিবুর রহমান ও অন্যান্য, 'স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাস', পূর্বোক্ত, ৬৭১।

— • —

প্রফেসর ড. মোহাম্মদ আখতার হোসেন ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ সেপ্টেম্বর বগুড়া জেলার ঢাকন্তা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আফতাব হোসেন ও মাতার নাম বেগম আছিয়া খাতুন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে ১৯৮৮ সালে স্নাতক (সম্মান) এবং ১৯৮৯ সালে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেন। এছাড়া তিনি ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করেন।

বাংলা একাডেমি ও বিভিন্ন প্রকাশনী থেকে লেখকের উল্লেখ্যযোগ্য ৩৫টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।

তিনি বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফোকলোর বিভাগে প্রফেসর ও চেয়ারম্যান পদে কর্মরত আছেন।